ভূমিকা

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুইখানি প্রাচীন মহাকাব্য। এই দুই মহাগ্রন্থ যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীকে আনন্দ ও জ্ঞান দান করিয়া আসিতেছে। এই মহাকাব্য দুইখানি হইতে প্রধান প্রধান ঘটনা এরূপ সুকৌশলে লওয়া হইয়াছে যে, পুস্তকখানি পাঠ করিলে রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে বালক-বালিকাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও আনন্দের সন্ধান মিলিতে পারিবে। তাহাদের আনন্দ দিতে পারিলে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

ইতি

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

রামায়ণের কথা

দস্যু রত্নাকর

চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকর ভীষণ দস্যু ছিল।

গভীর অরণ্যে পথিকদের হত্যা করিয়া সে তাহাদের ধনরত্ন অপহরণ করিয়া লইত। এইভাবে দস্যুবৃত্তির দ্বারা সে জীবিকা নির্ব্বাহ ও সংসার প্রতিপালন করিতেছিল।

এক দিবস ব্রহ্মা ও নারদ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সেই বনের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলেন। এদিকে এক উচ্চ বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া রত্নাকর তাহার শিকার অন্বেষণ করিতেছিল। এমন সময়ে ব্রহ্মা ও নারদকে অরণ্যের পথে আসিতে দেখিয়া দস্যু বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া পথে লৌহমুদ্গর হস্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মা ও নারদ নিকটে আসিতেই রত্নাকর বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দ্রুত বাহির হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল

ব্রহ্মা হাত তুলিয়া রত্নাকরকে বলিলেন—“বৎস, আমি সন্ন্যাসী, প্রাণের মায়া আমার নেই, আমাকে হত্যা করিতে চাও করিও; কিন্তু তোমাকে দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, আগে তাহার উত্তর দাও।”

রত্নাকর কি ভাবিয়া বলিল—“শীঘ্র বল।”

ব্রহ্মা—বৎস, কেন তুমি এই জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ? মানুষ মারিলে যে পাপ হয়, তাহা কি তুমি জান না?

রত্নাকর—তোমার মত কত শত সন্ন্যাসীকে অনায়াসে হত্যা করিয়াছি। পাপের কথাও মনে হয় নাই।

ব্রহ্মা—বৎস, কাহার জন্য এত পাপ করিতেছ? বল দেখি, কে তোমার পাপের ভাগী হইবে?

রত্নাকর—পথিকদের হত্যা করিয়া যে অর্থ পাই—তাহাতে মাতা, পিতা, পত্নী ও আমি এই চারিজনের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। অতএব তাহারা সকলেই আমার পাপের অংশ গ্রহণ করিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা—বৎস, তোমার এ অনুমান সত্য নয়; তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—একবার গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, সত্যই তাহারা তোমার পাপের ভাগী হইতে সম্মত কি না!

রত্না—ঠাকুর, আমাকে অত নির্ব্বোধ মনে করিও না। আমি গৃহে গেলেই তোমরা পলায়ন করিবে—একি আমি বুঝি না।

ব্রহ্মা—বৎস, আমরা সন্ন্যাসী, প্রাণভয়ে কখনও মিথ্যা বলি না, তোমার বিশ্বাস না হয় আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়া তুমি নিশ্চিন্ত মনে গমন কর. কোন ভয় নাই।

সন্ন্যাসীদের মুখের দিকে চাহিয়া রত্নাকরের বিশ্বাস হইল এবং সে তখনি গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

রত্নাকর প্রথমে স্বীয় জনকের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পিতা, আপনি জানেন আমি মানুষ মারিয়া যে অর্থ আনয়ন করি, তদ্দ্বারা আমাদের সকলের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। এক্ষণে সত্য করিয়া বলুন, হত্যাকার্য্যের জন্য যে পাপ হয়, তাহার ভাগী আপনিও কি না ?"

চ্যবন – বৎস, এমন অদ্ভুত কথা কখনও শুনি নাই। কোন শাস্ত্রে নাই যে, পুত্রকৃত পাপ পিতাকে স্পর্শ করে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমার কর্ত্তব্য—আমাকে প্রতিপালন করা। আমি ত' তোমাকে পাপ করিতে বলি নাই।

তখন বিষণ্ণ চিত্তে রত্নাকর একে একে মাতা ও পত্নীর নিকট গমন করিয়া ঐ একইরূপ প্রশ্ন করিল। বলা বাহুল্য, কেহই তাহার পাপের অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না।

এতক্ষণে দস্যুর চেতনা আসিল। দারুণ হতাশায় সে নিজের মস্তকে লৌহদণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরিয়া পাইয়া ভাবিল—একবার সন্ন্যাসীদের নিকট যাই—তাঁহারা যদি আমার উদ্ধারের উপায় বলিতে পারেন।

রত্নাকরের অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মার মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন—"রত্নাকর, রাম নাম উচ্চারণ কর—"

আশ্চর্য্য, রত্নাকর বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখে রাম নাম আসিল না!

তখন ব্রহ্মা নিকটস্থ বৃক্ষের একটি মরা ডাল দেখাইয়া রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐটি কি ?"

রত্নাকর বলিল—মরা কাঠ।

অতঃপর 'মরা' 'মরা' বলিতে বলিতে রত্নাকর 'রাম' বলিতে শিখিল।

ব্রহ্মা ও নারদ তাহাকে এই রাম নাম জপ করিবার উপদেশ দিয়া অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন রত্নাকর সেই অরণ্যে বসিয়া—দিনের পর দিন একইভাবে রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

দীর্ঘকাল একইভাবে বসিয়া তপস্যা করার ফলে তাঁহার দেহের চারিদিকে বল্মীকের স্তূপ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য তাঁহার নাম হইল বাল্মীকি।

দীর্ঘ সাধনায় তাঁহার মনে অপূর্ব্ব করুণার সঞ্চার হয় এবং যে দস্যু রত্নাকর শত শত মানুষ অনায়াসে হত্যা করিয়া আসিয়াছে, তিনিই মুনি বাল্মীকি হইয়া দুষ্ট ব্যাধের হস্তে একটি পাখীর মৃত্যু দেখিয়া করুণ সুরে এক মধুর শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ফেলেন।

যে মধুর ছন্দে তিনি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, সেই ছন্দেই তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এইভাবে দস্যু রত্নাকর মহাকবি বাল্মীকি হইয়াছিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র

অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্র অপত্যস্নেহে প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার পত্নী শৈব্যারও গুণের সীমা ছিলনা। একমাত্র পুত্র রুহিদাস ও পত্নীকে লইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাসুখে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কিন্তু হায়! বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? বিধির বিধানে রাজা হরিশ্চন্দ্র অভূতপূর্ব্ব বিপদে পতিত হইলেন। সেই কথাই বলা যাইতেছে।

কয়েকটি দেবকন্যা বিশ্বামিত্রের তপোবনে আসিয়া প্রত্যহ বড়ই উপদ্রব করিত। তাহারা ফুল তুলিয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া তপোবনটি তছ্‌নছ্‌ করিয়া চলিয়া যাইত।

একদিন মুনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া অভিশাপ দিলেন, অতঃপর যে আসিয়া উপবনে উৎপাত করিবে সে যেন লতার বাঁধনে আবদ্ধ হয়।

অন্য দিনের মত সেদিন উপবনে আসিয়া দেবকন্যারা মুনির অভিশাপে গাছের সহিত লতার বাঁধনে বাঁধা পড়িল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা সে বন্ধন মোচন করিতে পারিল না।

এমন সময়ে মৃগয়া করিতে করিতে রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই স্থানে আসিলে মেয়ে কয়টি করুণ সুরে রাজাকে তাহাদের মুক্ত করিতে বলিতে লাগিল। রাজা কন্যাদের অবস্থা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের মুক্ত করিয়া দিলেন।

এদিকে যথাসময়ে মুনি ফিরিয়া আসিয়া কন্যাদিগকে না দেখিয়া ধ্যানে সমস্ত বিষয় জানিলেন। কী রাজা হরিশ্চন্দ্রের এতদূর স্পর্দ্ধা! ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুনি তখনই অযোধ্যার রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মুনিকে দেখিয়া রাজা পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। "আজ আপনার পুণ্য আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল। আজ আমার জীবন সফল হইল।"

কিন্তু মুনি তখন ক্রোধে জ্বলিতেছেন। তিনি গম্ভীরভাবে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি যে কন্যাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাদের ছাড়িয়া দিলে কেন? আমাকে অবজ্ঞা করার স্পর্দ্ধা কিরূপে হইল?"

রাজা কন্যাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন—স্বীকার করিয়া বলিলেন—"মুনিবর আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না। অনুগ্রহপূর্ব্বক শান্ত হউন। আমি কখনও ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের অবজ্ঞা করি না। চিরদিন তাঁহাদের প্রতি ভক্তিশীল। নানাবিধ দানে তাঁহাদের তুষ্ট করিয়া থাকি। একথা ত' আপনি জানেন।"

তখন আরও ক্রোধের সহিত মুনি বলিলেন—"দান করিয়া থাক বলিয়া তোমার বড়ই অহঙ্কার দেখিতেছি। বেশ, আমাকে কিঞ্চিৎ দান কর দেখি?"

ইহাতে রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"আজ আমার জীবন সার্থক, কেননা আপনার ন্যায়মহামুনি আমার নিকট

দান গ্রহণ করিবেন। আপনি যাহাই প্রার্থনা করুন আমি তাহাই দান করিব, অঙ্গীকার করিতেছি।”

তখন মুনি বলিলেন—‘বেশ, আমি দান চাহিতেছি। তুমি আমাকে সমস্ত পৃথিবী দান কর।”

রাজা হরিশ্চন্দ্র মুনিকে সমস্ত পৃথিবী দান করিলেন।

মুনি ‘স্বস্তি’ বলিয়া দান গ্রহণ করিয়া বলিলেন—“এক্ষণে দানের জন্য কিছু দক্ষিণা প্রার্থনা করিতেছি।”

রাজা বলিলেন—“মুনিবর, আমি আপনাকে সাতকোটি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিতেছি, গ্রহণ করুন।” এই বলিয়া রাজা ভাণ্ডারীকে সাতকোটি স্বর্ণমুদ্রা আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন।

কিন্তু মুনি রাজাকে বলিলেন—“ভাণ্ডারীকে স্বর্ণমুদ্রা আনিতে বলিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভাণ্ডারীর উপর তোমার অধিকার কি, কাহার মুদ্রাই বা তুমি আমাকে দান করিতে চাও? তুমি পূর্ব্বেই ত’ সমস্ত পৃথিবী আমাকে দান করিয়া দিয়াছ। এক্ষণে ভাণ্ডারী কাহার অর্থ তোমাকে আনিয়া দিবে?”

এই কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন

মুনি বলিলেন—“রাজা, তোমাকে আদেশ দিতেছি। তুমি আমার পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্র গমন কর।”

রাজার অবস্থা দেখিয়া পাত্রমিত্র সকলে মুনির নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিল—“আপনি দয়া করিয়া রাজাকে থাকিবার জন্য একখানি গৃহ দান করুন।” কিন্তু ক্রোধান্ধ মুনি রাজাকে কোন অনুগ্রহ দেখাইতে সম্মত হইলেন না। শাস্ত্রমতে বারাণসী পৃথিবীর বাহিরে। তিনি রাজাকে বারাণসীতে যাইয়া বাস করিবার পরামর্শ দিলেন।

বিশ্বামিত্রের কথা অনুসারে রাজা পত্নী ও একমাত্র পুত্রকে

লইয়া কাশী যাইতে উদ্যত হইলে মুনি বলিলেন—"রাজা, আমার দক্ষিণা সাতকোটি স্বর্ণমুদ্রা না দিয়া কোথায় যাইতেছ ?"

রাজা মুনির নিকট সাতদিনের সময় প্রার্থনা করিলেন।

অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা স্থির করিলেন। নিকটস্থ এক হাটে গিয়া রাজা "দাসী চাই" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

এক ব্রাহ্মণের দাসীর প্রয়োজন ছিল। তিনি আসিয়া চারকোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া শৈব্যাকে কিনিয়া লইলেন। কিন্তু শৈব্যাকে তাঁহার শিশুপুত্র ধরিয়া রাখিতে চায়। সে জননীকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। তখন শৈব্যা কাতর স্বরে ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রটিকে আমার সহিত আসিতে অনুমতি দিউন।'

ব্রাহ্মণ অনুমতি দিলে রোহিতাশ্বও জননীর সহিত চলিল। শৈব্যা ও রোহিতাশ্ব চলিয়া গেল। রাজা হরিশ্চন্দ্র অনিমেষ নয়নে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন। অতঃপর মুনির নিকট গিয়া চারকোটি স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করিলে মুনি বলিলেন—"আমি সাতকোটি স্বর্ণমুদ্রার কম গ্রহণ করিব না।"

তখন হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করিয়া ঋণমুক্ত হইবেন স্থির করিয়া এক হাটে গিয়া "কে নফর লইবে" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। কালু নামে এক হাড়ির শূকর রাখিবার জন্য একটি লোকের প্রয়োজন ছিল। সে তিনকোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া হরিশ্চন্দ্রকে কিনিয়া লইল।

তখন সাতকোটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া মুনি মহানন্দে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র কালুর সহিত তাহার বাটীতে গমন করিলেন। কালু

তাহার নাম বদলাইয়া হরিদাস বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শূকরের তত্ত্বাবধান করা এবং কাশীর শ্মশানে মৃতদেহ-সৎকারের জন্য পণ আদায় করা হরিশ্চন্দ্রের কাজ হইল।

এদিকে ব্রাহ্মণের বাটীতে শৈব্যা দাসীর কাজ করিয়া কাল কাটাইতেছেন। একদিন তাঁহার পুত্র রুহিদাস ব্রাহ্মণের আদেশে বনে গেল পূজার ফুল তুলিতে। কিন্তু হায়! ফুলবনে একটি বিষধর সর্পের দংশনে তাহার মৃত্যু ঘটিল।

বালকের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া জননী চিন্তান্বিতা হইয়া তাহাকে খুঁজিতে গেলেন। অনতিবিলম্বে পুত্রের মৃদদেহ দেখিতে পাইয়া তাহাকে বুকে লইয়া পুত্রহারা জননী আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হায় রাজা হরিশ্চন্দ্র! এ দুঃসময়ে তুমি কোথায়? আজ একবার আসিয়া তোমার আদরের পুত্র রুহিদাসকে দেখিয়া যাও।" ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে সময়োচিত প্রবোধ দিয়া বারাণসীতে গিয়া মৃতদেহ দাহ করিবার পরামর্শ দিলেন।

শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতদেহ লইয়া বারাণসী গমন করিলেন। শ্মশানে ক্রন্দন শুনিয়া হস্তে মুদ্গর লইয়া হরিদাসবেশী হরিশ্চন্দ্র আসিয়া মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য শৈব্যার নিকট পণ চাহিতে লাগিলেন। কেহই কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। শৈব্যা অর্থ দিতে অসমর্থা জানিয়া হরিদাস মৃতদেহ দাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের নাম ধরিয়া কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হায় রাজা হরিশ্চন্দ্র! তুমি কোথায়? আজ কিনা অর্থের জন্য তোমার পুত্রের সৎকার হইতেছে না!"

তখন হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে চিনিলেন। পুত্রশোকে অধীর হইয়া স্বামী স্ত্রী উভয়েই পুত্রেরই সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে গেলে

ধর্ম্মরাজ আসিয়া পুত্রটিকে বাঁচাইয়া দিলেন। কালু ও ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে ও রাণীকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন।

এমন সময়ে বিশ্বামিত্র মুনি আসিয়া সেখানে উপস্থিত। রাজত্ব লইয়া তাঁহার জপতপ কিছুই হইতেছে না। তিনি হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার রাজত্ব ফিরাইয়া লইতে বলিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুনি, কেমন রাজত্ব করিলেন?"

মুনি এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তিনি রাজাকে অবিলম্বে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন।

রামচন্দ্রের বিবাহ

অযোধ্যার রাজা দশরথের চার পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে রাজা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন।

চার পুত্র লইয়া রাজা দশরথ সুখে রাজত্ব করিতেছেন, এমন সময়ে মিথিলা হইতে বিশ্বামিত্র মুনি আসিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত। দুরাত্মা রাক্ষসদের অন্যায় অত্যাচারে মুনিদের যজ্ঞকার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বামিত্র সকলকে আশ্বাস দিয়া অযোধ্যায় চলিয়া আসিয়াছেন শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে।

বিশ্বামিত্রের আগমনসংবাদ পাইয়া রাজা দশরথ চিন্তিত। তাঁহার হরিশ্চন্দ্র রাজার কথা মনে আসিয়াছে। না জানি, মুনি আবার কি অনর্থ ঘটান! যাহা হউক, মহাসমাদরে রাজা মুনির

অভ্যর্থনা করিলেন—"আপনার শুভাগমনে রাজপুরী পবিত্র হইল। এক্ষণে আদেশ করুন।"

মুনি বলিলেন—"রাক্ষসেরা যজ্ঞের বড়ই বিঘ্ন করিতেছে। এজন্য শ্রীরামচন্দ্রকে লইতে আসিয়াছিলাম। তাহাকে আমার সহিত দাও।"

মুনির কথা শুনিয়া রাজা দশরথ ভয়ে ও চিন্তায় অধীর হইয়া বিমর্ষভাবে মুনিকে বলিলেন—"হে মহামুনি, রাম বালকমাত্র, সে কিরূপে দুরন্ত রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিবে? আদেশ করুন, সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিয়া—"

মুনি বলিলেন—"মহারাজ, বৃথা বাক্য ব্যয় করার আবশ্যক নাই। রাক্ষসনিধনে রামকেই আমার প্রয়োজন।"

তখন রাজা অতিশয় কাতর হইয়া বলিলেন—"মুনি আমাকে দয়া করুন। আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ। আপনি জানেন, রামকে তিল-মাত্র না দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না। আপনি প্রাণ দিতে বলিলে তাহাও অনায়াসে দিতে পারি, কিন্তু রামকে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

রাজার কথা শুনিয়া মহাকুপিত হইয়া মুনি বলিলেন—"এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার প্রার্থনা বিফল করিতে চাও! যদি ভাল চাও, অবিলম্বে রামকে অর্পণ কর।"

তখন অনেক ভাবিয়া রাজা এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি ভরত ও শত্রুঘ্নকে ডাকাইয়া রাম লক্ষ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া মুনিকে অর্পণ করিলেন।

কিন্তু কিছুদূর গিয়াই মুনি বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন। তখন মহাক্রোধে তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল।

দ্রুত রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাঁহার চোখের আগুনে প্রজাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়া যাইবার উপক্রম। প্রজারা মহাভয়ে ভীত হইয়া "রক্ষা কর", "রক্ষা কর" বলিয়া রামের নিকট ছুটিয়া গেল।

রাম প্রজাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মুনির নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং মিথিলায় যাইতে সম্মত হইলেন। রামের কথা শুনিয়া মুনির আর ক্রোধ থাকিল না।

আনন্দিত চিত্তে রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া মুনি পথ চলিতেছেন। একদিন তাঁহারা তাড়কা নামে এক ভীষণা রাক্ষসীর বনে আসিয়া দেখা দিলেন। রামের ধনুকের টঙ্কার শুনিয়া তাড়কা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিল। "আজ তোর প্রাণ লইব"—বলিয়া তাড়কা মহাক্রোধে মস্ত এক পর্ব্বত লইয়া রামকে আঘাত করিতে গেল। রাম ধনুকে বজ্রবাণ জুড়িয়া তাড়কাকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর আরও অসংখ্য রাক্ষস নিহত করিয়া রাম মুনিগণকে নিশ্চিন্তে যজ্ঞ করিবার সুবিধা করিয়া দিলেন।

এদিকে মিথিলার রাজা জনকের কন্যা সীতার এখনও বিবাহ হয় নাই। পরমাসুন্দরী ও মধুরস্বভাবা সীতাকে বিবাহ করিবার জন্য বড় বড় রাজা আসিয়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছেন। কারণ, জনক রাজার এক অদ্ভুত পণ ছিল। ভৃগুরাম একখানি হরধনু দিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"যে এই ধনুকে গুণ দিতে সহিত সীতার বিবাহ দিতে হইবে।"

অন্য রাজার কথা থাক, লঙ্কার মহাপ স্বয়ং রাবণ পর্য্যন্ত ধনুকে গুণ দিতে গিয় হইয়াছিলেন।

রাবণ মহাজাঁকজমকের সহিত রথে চড়িয়া মিথিলায় আগমন করিলে জনক রাজা প্রমাদ গণিলেন। রাবণকে স্বেচ্ছায় কন্যা না দিলে সে কাড়িয়া লইবে, অথচ দুষ্ট রাবণের সহিত লক্ষ্মী-প্রতিমাস্বরূপা সীতার বিবাহ দিতে জনকের মন সরিতেছিল না।

যাহা হউক, রাবণকে মহাসমাদরে জনক অভ্যর্থনা করিলেন। রাবণ হাসিতে হাসিতে সীতাকে প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন—"আমার মহাসৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় বীরের হস্তে কন্যা দিব। তবে কিনা ভৃগুরাম আবার একখানি ধনুক রাখিয়া বলিয়া গিয়াছেন—সীতাকে যে লাভ করিতে চায়, তাহাকে ধনুকে গুণ দিতে হইবে।"

রাবণ এই কথা শুনিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন—"আমি মন্দার পর্ব্বত উত্তোলন করিয়াছি। আর আমার নিকট কিনা সামান্য ধনুকের বিক্রমের কথা বলিতেছেন! আগে বিবাহটা হইয়া যউক, তাহার পরে না হয় যাইবার সময়ে ধনুকখানি ভাঙিয়া রাখিয়া যাইব।"

কিন্তু জনক সবিনয়ে জানাইলেন যে, পণরক্ষা করিয়া চলাই কর্ত্তব্য। এরপর আর কথা চলে না। তখন রাবণ বীরবিক্রমে ধনুকের ঘরে গেলেন। কিন্তু হায়! ধনুক তোলা দূরের কথা, তিনি কিছুতেই ধনুকখানি নাড়িতেও সমর্থ হইলেন না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া ধনুকখানি তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্জ্জয়
তিনি ভরত ও শত্রুটল। তখন রাবণ ভীষণ অপ্রস্তুত হইয়া রথে
মুনিকে অর্পণ করিলেন মিথিলা ছাড়িয়া পলাইয়া বাঁচিলেন।

কিন্তু কিছুদূর গিাজার ঘরে বিশ্বামিত্র মুনি রামলক্ষ্মণকে লইয়া
সহিত প্রতারণা করিয়া। রামচন্দ্রকে দেখিয়া জনক রাজা উল্লসিত হইয়া
অগ্নি বহির্গত হইতে ল

জনকের অভিপ্রায় অনুসারে রাম ধনুকের ঘরে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত লোকে কৌতূহলভরে লক্ষ্য করিতে লাগিল—সামান্য বালক রাম কি এই দুর্জ্জয় ধনুকে গুণ দিতে সমর্থ হইবেন?

দেখিতে দেখিতে রাম অবলীলাক্রমে সেই বিরাট ধনুক তুলিয়া ফেলিয়া জনককে বলিলেন—"মুনির ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ভয় হয়, এখন যাহা আজ্ঞা হয়।"

জনক হরষিত হইয়া উত্তর করিলেন—"রাম, যদি পার, ধনুক ভাঙিয়া ফেল, আমরা কৌতুক দেখিব।" রাম অবলালাক্রমে ধনুক ভাঙিয়া ফেলিলেন। ধনুকের মড় মড় শব্দে কত লোক চেতনা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

সমস্ত মিথিলায় আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। জনক মহাসমারোহে অযোধ্যা হইতে রাজা দশরথকে লইয়া আসিলেন। জনকের দুই কন্যার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের আর তাঁহার ভ্রাতার দুই কন্যার সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির শুভ বিবাহের পর রাজা দশরথ রামসীতা প্রভৃতিকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য জনক রাজার নিকট অনুমতি নিলেন।

রামসীতা চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া দীনদুঃখীকে নানা অর্থ দান করিতে লাগিলেন।

এদিকে চারিদিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া পরশুরাম সচকিত হইয়া উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন—তবে কি ধনুকে গুণ দিয়া সীতাকে কেহ বিবাহ করিয়া লইয়া গেল ?

জনক রাজা সীতাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। সীতা চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূরিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সীতাকে বলিতে লাগিলেন— "মা, তোমার মিথিলার কথা বিস্মৃত হইও না, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি করিও। কখনও কাহাকেও রাগ, দ্বেষ, অসূয়া করিও না।

সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, কখনও স্বামিসেবায় বিরত হইও না।” এদিকে আবার রাজপুরী হইতে নারীগণ আসিয়া সীতার গলা ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সীতাও অবিরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় রামসীতা মিথিলা হইতে বিদায় লইয়া অযোধ্যার দিকে চলিতেছেন, এমন সময়ে বিরাট কুঠার হস্তে পরশুরামকে পিছন হইতে “অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর”—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। খড়্গ, চর্ম্ম ও ধনুঃশরে সজ্জিত হইয়া ভীমবেগে ভার্গব পরশুরাম সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন দেখিয়া দশরথের শরীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি রাম ও লক্ষ্মণকে মুনির চরণে প্রণত করাইয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইলেন।

পরশুরাম দশরথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“জনকের ঘরে কে ধনুক ভাঙিয়াছে?”

দশরথ বিনীতভাবে বলিলেন—“আমার পুত্র রাম ধনুকে গুণ দিতে গেলে ধনুক ভাঙিয়া দুইখণ্ড হইয়া গিয়াছে।” পরশুরাম মহাক্রোধে বলিলেন—“তোমার এত স্পর্দ্ধা যে, আমার নামে পুত্রের নাম রাখিতে সাহসী হইয়াছ?” তখন রাম বলিলেন—“প্রভু, তপস্বী ব্রাহ্মণ আপনি, আমার দোষ ক্ষমা করুন।”

পরশুরাম বলিলেন—“তপস্বী বলিয়া অবহেলা করিতেছ? জান, আমি তিনবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছি। যে আমার গুরুর ধনুক ভাঙিতে সাহসী হইয়াছে, আজ তাহাকে বধ করিয়া উপযুক্ত প্রতিফল দিব।” তখন রাম বলিলেন—“আপনি যে সময়ে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন, তখন রাম ও লক্ষ্মণ জন্মলাভ করে নাই।

রামের কথা শুনিয়া পরশুরাম মহাক্রুদ্ধ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"জীর্ণ ধনুক ভাঙিয়া খুব যে আস্ফালন করিতেছ! আচ্ছা, আমার ধনুকে একবার গুণ দাও ত' দেখি!"

অহঙ্কার করিয়া পরশুরাম রামকে ধনুক দিয়া ভাবিলেন—বোধ হয় ধনুকের চাপেই রাম মারা যাইবে। রাম অনায়াসে ধনুক ধরিয়া বলিলেন—"মুনি, যদি ধনুক দিলেন, তবে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক একটা বাণও দিন।" পরশুরাম রামকে একটি বাণ দিলে ধনুকে গুণ দিয়া ও বাণ যোজনা করিয়া রাম বলিলেন—"হে মুনি, ব্রহ্মবধ হইবে বলিয়া তোমাকে মারিতে পারিব না, কিন্তু আমার বাণ ত' ব্যর্থ হইবার নয়, এখন কি করি?"

তখন পরশুরাম বুঝিলেন, রাম সামান্য মানুষ নহেন তিনি পরাজয় স্বীকার করিলেন।

রাজা দশরথ রামের বিবাহ দিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং মহানন্দে রাজত্ব পরিচালনা করিতেছেন। এই সময়ে নানাদেশ হইতে সামন্ত রাজারা একদিন রাজসভায় আসিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া রাজার প্রীতি-উৎপাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিল—"মহারাজ, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা বড়ই ভালবাসি। তা ছাড়া, তাঁহার বীরত্বের সুখ্যাতিও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে শুভদিনে তাঁহাকে সিহাসন প্রদান করিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন।"

রাজাদের কথা শুনিয়া রাজা দশরথ মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু মুখে কপট কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"কেন, আমি আপনাদের নিকট কি অপরাধ করিলাম? আমি কি আপনাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছি। আমি কি অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছি না?"

দশরথকে কুপিত দেখিয়া রাজারা ভীত হইয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তখন রাজা হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে বলিলেন—"আপনাদের কথা শুনিয়া আমি যারপরনাই আনন্দলাভ করিয়াছি। রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কথা আমিও মনে করিতেছিলাম। যাহা হউক, অবিলম্বে আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিব।"

রামের অভিষেকের কথা প্রচারিত হইবামাত্র রাজ্যে আনন্দের প্লাবন প্রবাহিত হইল। প্রজারা মহানন্দে উৎফুল্ল হইল। রাণী কৌশল্যা মহানন্দে দানধ্যান আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু হায় অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল!

রাজা দশরথের অন্য রাণী কৈকেয়ীর এক দাসী ছিল। তাহার নাম মন্থরা। সে যেমন কদাকার ছিল দেখিতে, তেমনি নীচ ছিল তাহার মন। প্রজাদের ঘরে ঘরে এই আনন্দ মন্থরার সহ্য হইল না। সে মনে এক দুষ্ট সঙ্কল্প লইয়া কৈকেয়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং রামের রাজা হওয়ার সংবাদ জানাইল।

কৈকেয়ী রামকে খুবই ভালবাসিতেন এবং মন্থরার নিকট রামের রাজা হওয়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একখানি অলঙ্কার প্রদান করিলেন। তখন মন্থরা অত্যন্ত চতুরতার সহিত কৈকেয়ীকে বুঝাইতে লাগিল—"আপনি অতীব বুদ্ধিহীনা, রাম রাজা হইলে আপনার অবস্থা কি হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আপনি রাজমাতা

কৌশল্যার দাসীর ন্যায় থাকিবেন। কৌশল্যাকে রাজমাতা বলিয়া সকলে কত সম্মান করিবে, আপনার নামও কেহ করিবে না। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ রাজত্ব করিবে, ভরতকে তাহারা ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না।"

কুঁজীর এইরূপ কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর বুদ্ধিনাশ হইল। তিনি কুঁজীর যুক্তিদ্বারা চালিত হইয়া সমস্ত অযোধ্যার সর্ব্বনাশ করিতে চলিলেন।

বহুকাল পূর্ব্বে রাজা দশরথ একবার যুদ্ধে আহত হইলে রাণী কৈকেয়ী প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন। ইহাতে তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। আজ সুযোগ বুঝিয়া কৈকেয়ী সেই দুইটি বর রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। এক বরে ভরতের জন্য সিংহাসন দাবী করিয়া, অন্য বরে রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইতে কৈকেয়ী দশরথকে অনুরোধ করিলেন।

এই নিদারুণ কথা শুনিয়া রাজা দশরথ প্রথমে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; পরে চেতনা ফিরিয়া পাইয়া তিনি কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কৈকেয়ীর মন টলিল না।

রাজা দশরথের নিকট হইতে রামচন্দ্রের ডাক আসিয়াছে। রাম ও লক্ষ্মণ রথে চড়িয়া দশরথের গৃহে গমন করিতেছেন। পথে আনন্দিত প্রজারা সারি সারি দাঁড়াইয়া উল্লসিত হৃদয়ে রামচন্দ্রকে বন্দনা করিতেছে, রামের গুণকীর্ত্তন করিতেছে।

রাম দশরথের ঘরে গিয়া দেখিলেন, দশরথ ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া আছেন। সম্মুখে কৈকেয়ীকে দেখিয়া রাম জিজ্ঞাসা করিলেন —"মাতা, আপনি আমাদের বলুন, পিতা কেন বিষণ্ণ হইয়া ধূলায়

পড়িয়া আছেন? ক্রুদ্ধ অবস্থায় থাকিলেও পিতা আমাদের দেখিলেই হাসিতে থাকেন, আর আজ আমাদের ফিরিয়াও দেখিতেছেন না, ইহার কারণ কি? কি করিলে পিতার দুঃখ দূর হইবে, পিতা পুনরায় প্রসন্ন হইবেন, আপনি দয়া করিয়া তাহা আমাকে বলুন।"

তখন কৈকেয়ী রামকে বলিলেন—"বৎস রামচন্দ্র, তোমার পিতা আমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন—আজ আমি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিয়াছি। এই বরে ভরতকে রাজ্য দিতে ও অন্য বরে তোমাকে বনে পাঠাইবার জন্য আমি রাজাকে অনুরোধ করিয়াছি। শিরে জটা ধরিয়া এবং বল্কল পরিধান করিয়া তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে গিয়া বনের ফলমূল খাইয়া অতিবাহিত করিতে হইবে। এই প্রার্থনায় রাজা বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া রাম বিন্দুমাত্র বিষণ্ণ না হইয়া উত্তর দিলেন —"মাতা, পিতার বলিবার প্রয়োজন কি? আপনার আদেশই ত' যথেষ্ট। আপনি আদেশ দিলেই আমি নিশ্চয় তাহা শিরোধার্য্য করিতাম। আপনার প্রীতির জন্য এবং পিতার কথা রাখিবার জন্য আমি অনায়াসে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে অতিবাহিত করিব।"

অনন্তর রামচন্দ্র পিতা ও কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করিয়া বনে গমনের উদ্যোগ করিতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। দশরথ আরও তীব্রস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামকে কিছু বলিতে পারিলেন না।

সীতা ও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া রাজপুরীতে থাকিতে সম্মত হইলেন না। রাম তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন,

কিন্তু অবশেষে এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী ও দুই রাজপুত্র শিরে জটা ধরিয়া ও বল্কল পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় রাজপুরীর বাহির হইলে অযোধ্যাবাসিগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল।

রাম তাহাদিগকে নানারূপে বুঝাইয়া কোনক্রমে নিবারণ করিলেন।

ভরতের পাদুকা গ্রহণ

অযোধ্যার এই সর্ব্বনাশের বিষয় ভরত কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। এই সময়ে তিনি মাতুলালয়ে ছিলেন। রামের বনগমনের পর দশরথ প্রাণত্যাগ করিলে অযোধ্যা হইতে দূত প্রেরিত হইল ভরতকে অবিলম্বে অযোধ্যায় লইয়া আসিবার জন্য।

ভরত গতরাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাঁহার মন অতিশয় ভারাক্রান্ত। এই সময়ে দূতগণ আসিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে অযোধ্যায় যাইতে হইবে—এই সংবাদ প্রদান করিল। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অযোধ্যার জন্য ভরত বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবিলম্বে রথে আরোহণ করিয়া ভরত অযোধ্যার উদ্দেশে গমন করিলেন।

কিন্তু অযোধ্যায় আগমন করিয়াই ভরতের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। অযোধ্যায় প্রজাদের মুখ এত মলিন বোধ হইতেছে কেন? অনেকদিন পরে দেশে আসিলাম, অথচ কেহই ত' নিকটে আসিয়া সম্ভাষণ করিতেছে না! এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে ভরত পিতার ভবনে আগমন করিলেন।

পিতার গৃহ শূন্য দেখিয়া ভরত আশ্চর্য্য হইয়া মাতার গৃহে

গমন করিলেন। ভরত মায়ের চরণ বন্দনা করিলে রাণী পুত্রকে চুম্বন করিয়া পিতৃগৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন ভরত সেখানকার সকলের কুশল জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, অযোধ্যার এমত অবস্থা কেন, আমাকে বল। সকলেই বিষণ্ণ প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইতেছে, আমাকে দেখিয়া নিন্দা করিতেছে, পিতাই বা কোথায়? তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। অযোধ্যার এরূপ অবস্থা কেন?"

কৈকেয়ী ভরতকে দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে ভরত পরশুছিন্ন বনবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে বলিলেন—"মা এক্ষণে বলুন, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কোথায়? পিতার অভাবে তাঁহাদের দেখিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

তখন কৈকেয়ী ভরতকে রাজ্য দিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, একে একে সমস্ত ভরতের নিকট বর্ণনা করিলেন। মহাদুঃখে ভরত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর ধীর বিষণ্ণকণ্ঠে জননীকে বলিতে লাগিলেন—"হায়! কেন তোমার এরূপ মতিভ্রম হইল! রাজকুলে জ্যেষ্ঠের বিদ্যমানে কনিষ্ঠ রাজা হয়, ইহা কে কোথায় শুনিয়াছে? রঘুবংশ-ধ্বংসের জন্য বোধ হয় তুমি এরূপ কার্য্য করিয়াছ!"

ভরতের ক্রোধ দেখিয়া বিষণ্ণা হইয়া কৈকেয়ী অন্যঘরে চলিয়া গেলেন।

এদিকে ভরতের আগমন সংবাদ শুনিয়া দুষ্টা মন্থরা ভাবিল, যাই, ভরত আমার কথা শুনিয়া নিশ্চয় বড় একটা পুরস্কার দিয়া আমাকে খুশী করিবে। সে মহানন্দে সেই স্থানে আগমন করিল।

তাহার আনন্দ দেখিয়া শত্রুঘ্ন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বিরাট কুঁজ মাটিতে ঘষিতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মন্থরা কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা চাহিতে থাকিলে ক্ষমার অবতার ভরত শত্রুঘ্নকে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ছাড়া পাইয়া—খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কোন প্রকারে কুঁজী সেস্থান পরিত্যাগ করিল।

দশরথের শ্রাদ্ধকৃত্যের পর ভরত রাজপুরীর সকলকে সঙ্গে করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। বশিষ্ঠ ভরতকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ। রাম পিতৃ-সত্য পালনের জন্য বনে গিয়াছেন। তাঁহাকে কখনই ফিরাইতে পারিবে না।"

ভরত বলিলেন—"আপনি এমন কথা বলিবেন না। রামকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজ্যভার তাঁহাকে না দিতে পারিলে আমার স্বস্তি নাই।"

ভরত অযোধ্যার রাজপুরীর সকলকে লইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পথে গুহক চণ্ডাল ভরতকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল।

"বাকল পরাইয়া বনে পাঠাইয়াও ভাইকে নিষ্কৃতি দিবে না! এখন আবার বনে আসিয়া তাহাকে হত্যা করিতে চায়! আজ সমস্ত সৈন্যসামন্ত সহিত ভরতকে হত্যা করিব।"—এই বলিয়া গুহক তাহার দলবল লইয়া ভরতের পথে দণ্ডায়মান হইল। ভরতকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া গুহক নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

কতকদূরে গিয়া এক বৃক্ষমূলে তৃণশয্যা দেখিয়া ভরত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। অযোধ্যার রাজপুত্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা এই তৃণশয্যায় রাত্রিযাপন করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ভরত সংজ্ঞাহারা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কাহারও কথা তাঁহার কানে যাইতেছিল না। তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন ভরত বলিলেন—"আজ হইতে আমিও বল্কল পরিয়া তৃণ-শয্যায় শয়ন করিব।"

পথে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম অতিক্রম করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া ভরত রামচন্দ্রের সন্ধান পাইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

পথপর্য্যটনে শ্রান্ত ও শোকে বিষণ্ণ ভরতকে দেখিয়া রাম প্রথমে চিনিতেই পারিলেন না। অবশেষে ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া রাম তাঁহার বনে আসার কারণ জানিতে চাহিলেন।

ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু রাম কিছুতেই ফিরিতে স্বীকৃত হইলেন না। অথচ রামকে না লইয়া ভরত কিছুতেই রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে সম্মত নহেন। তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাম তাঁহাকে বহু সমাদরে নিজের পাদুকা অর্পণ করিলেন।

ভরত শ্রীরামের পাদুকা লইয়া বিষণ্ণ চিত্তে রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। রামচন্দ্রহীন অযোধ্যায় থাকিতে না পারিয়া ভরত নন্দীগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেখানে বল্কল পরিধান করিয়া ফলমূলাহারী এই রাজা রামের পাদুকার উপর ছত্রধারণ করিয়া দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সীতা হরণ

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অরণ্যে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর সুখের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বনে বনে ঘুরিয়া ফল পাড়িয়া আনেন। অস্ত্র লইয়া কুটীরের দ্বারে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেন।

দুরন্ত রাক্ষসেরা যাহাতে রাম ও সীতার কোন ক্ষতি করিতে না পারে এজন্য লক্ষণের চোখে নিদ্রা নাই। কিন্তু ঈশ্বরের বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে! তিনি যাহা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে!

পঞ্চবটী বনে পাতার কুটীরে শ্রীরাম সুখে শান্তিতেই কাল কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা রাবণের ভগ্নী সূর্পণখা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সে লক্ষ্মণকে বিবাহ করিতে চায়। লক্ষ্মণ যতই তাহাকে বুঝাইতে চাহেন যে, তিনি ব্রহ্মচারীর ন্যায় বনে কাল কাটাইতেছেন, বিবাহ করিতে পারিবেন না, সে ততই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মণ এক বাণে এই রাক্ষসীর নাক-কান কাটিয়া ফেলিলেন।

ভীষণ রক্তাক্ত অবস্থায় সূর্পণখা রাক্ষসরাজ রাবণের সভায় গিয়া রাম ও লক্ষণের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ করিল। রাবণ সমস্ত শ্রবণ করিয়া ও ভগ্নীর ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিয়া সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া রামলক্ষ্মণকে শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন। তিনি মারীচ নামক তাঁহার এক পাত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া সীতাহরণের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

মারীচ এই ঘৃণিত কাজ করিতে নিষেধ করিয়া রাবণকে নানাভাবে বুঝাইলেন। কিন্তু রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"যদি ভগবান পঞ্চাননও আমাকে নিষেধ করেন, তথাপি সীতাকে হরণ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিব না। তুমি ছলনা করিয়া রামকে দূরে লইয়া যাও। আমি শূন্যপুরী হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিব।"

মারীচ আর কি করেন। রাবণের ভয়ে এই কুকার্য্যে সহায়তা করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর রাবণ ও মারীচ পঞ্চবটী বনে গমন করিলেন। রাবণ বনে লুকাইয়া থাকিলেন, আর মারীচ এক সুন্দর স্বর্ণমৃগের মূর্তি ধরিয়া রামসীতার নিকট দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

সীতা মৃগটিকে দেখিয়া রামকে তাহা ধরিয়া দিতে বলিলে রাম লক্ষ্মণকে কুটীরে থাকিতে বলিয়া মৃগটিকে ধরিতে গেলেন। মারীচ নানাদিকে নানাভাবে দৌড়াইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মৃগটিকে না মারিয়া ধরিবেন বলিয়া তাহার পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গেলেন।

অবশেষে মৃগটির অদ্ভুত চাতুরী দেখিয়া রামের সন্দেহ হইল এবং তীক্ষ্ণবাণ সন্ধান করিয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন।

মরিবার পূর্ব্বে মারীচ ঠিক রামের স্বর অনুকরণ করিয়া কাতর আর্ত্তনাদে বন পূর্ণ করিয়া বলিলেন—"ভাই লক্ষ্মণ, দুষ্ট নিশাচরের হাতে প্রাণ যায়, শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর।"

রাম ব্যস্ত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের নিকট আসিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা রামের স্বর শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া লক্ষ্মণকে দ্রুত রামের সাহায্যে গমন করিতে বলিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ মায়াবী রাক্ষসদের বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি সীতাকে একা রাখিয়া কোথাও যাইতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন—রাম কখনও পরাভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে পারেন না। কিন্তু লক্ষ্মণের বাক্যে সীতা প্রবোধ মানিতে চাহিলেন না। তিনি লক্ষ্মণকে নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এইভাবে তিরস্কৃত হইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তবে যাইবার পূর্ব্বে লক্ষ্মণ একটি গণ্ডি দিয়া সীতাকে তাহার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া গেলেন।

বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। লক্ষণ অন্তর্হিত হইতেই তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সীতার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। তপস্বী দেখিয়া সীতা ভক্তিভাবে মধুর বচনে বলিলেন—"আপনি ক্ষণিক অপেক্ষা করুন। শীঘ্রই আমার স্বামী ও দেবর আসিয়া আপনাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবেন। তাঁহারা অতিথি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইবেন।" কিন্তু তপস্বী বলিলেন—"আমি ক্ষুধার্ত্ত। এখন বিলম্ব করিতে পারিব না। যদি ভিক্ষা না দাও, বল এখন চলিয়া যাই।" তখন সীতা মনে মনে চিন্তা করিলেন—গৃহে আসিয়া তপস্বী ফিরিয়া গেলে ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হইবে, না জানি স্বামী ফিরিয়া আসিয়া কি বলিবেন! এই সমস্ত ভাবিয়া সীতা ভিক্ষা লইয়া যে মুহূর্ত্তে গণ্ডির বাহির

হইলেন, অমনি তপস্বীর বেশে রাবণ সীতাকে ধরিয়া রথে তুলিয়া লইয়া লঙ্কার দিকে প্রস্থান করিলেন। সীতাকে লঙ্কায় লইয়া গিয়া রাবণ তাঁহাকে অশোক কাননে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন।

এদিকে লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাম বিপদের আশঙ্কা করিলেন ও অতি দ্রুত কুটীরের দিকে ধাবিত হইলেন। দুই ভাই কুটীরে আসিয়া দেখিলেন সীতা সেখানে নাই। ভীত ও ব্যাকুল হইয়া দুই ভাই বনের চতুর্দ্দিকে বার বার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়, কোথাও সীতাকে পাওয়া গেল না। ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থানে জটায়ু নামক এক বৃদ্ধ পক্ষিরাজকে মৃতবৎ দেখিতে পাইয়া রাম মনে করিলেন যে, এই পক্ষীই সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাম তাহাকে মারিতে গেলে জটায়ু বলিল—"আমাকে মারিয়া ফল কি? দুষ্ট রাক্ষসরাজ সীতাকে লইয়া লঙ্কায় প্রস্থান করিয়াছে! সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়াই আমার এই দুর্দ্দশা।" এই কথা বলিতে বলিতে জটায়ু প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন দুইভাই জটায়ুর সৎকার করিয়া সীতা-উদ্ধারের নিমিত্তর লঙ্কা দিকে ধাবিত হইলেন।

সীতা-উদ্ধারের জন্য রাম ও লক্ষ্মণ দুইভাই সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল লঙ্কা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানর রাজা সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া রাম সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া রাবণের সহিত ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু সৈন্যসামন্ত নিহত হইয়াছে। রাবণের বীর পুত্রগণ এবং ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এই সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন। কিন্তু রাবণের মৃত্যু কিছুতেই হয় না। ব্রহ্মার বরে রাবণের মাথা কাটা গিয়া আবার জোড়া লাগিয়া যায়।

কিন্তু রাবণের ভ্রাতা ধার্মিক বিভীষণ সীতাহরণে বিরক্ত হইয়া রামের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি রাবণবধের উপায়

রামকে বলিয়া দিলেন—"প্রভু রামচন্দ্র, আমার পূর্ব্বের কথা স্মরণ হইয়াছে। আমরা তিন ভাই কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলাম। ব্রহ্মা আসিয়া রাবণকে বর দিতে চাহিলে রাবণ অমর হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা সম্মত হইলেন না। রাবণ পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন —আমি তোমাকে ব্রহ্মবাণ দিতেছি। এই অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না। আর তোমার নিজের ঘরেই এই অস্ত্র থাকিবে। রাবণ সন্তুষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মবাণ লইয়া রাণী মন্দোদরীর নিকট রাখিতে দিয়াছে, কিন্তু কোথায় এই অস্ত্র লুকায়িত আছে, তাহা রাবণ ও মন্দোদরী ছাড়া আর কেহ জানে না।" রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া বলিলেন—"তবে রাবণের মৃত্যু কিরূপে সম্ভব হইবে? এমন কে আছে, যে রাবণের গৃহে গিয়া মৃত্যুবাণ আনিতে পারিবে?"

তখন হনুমান সবিনয়ে উত্তর করিলেন—"প্রভু, কি জন্য চিন্তা করিতেছেন? আমি এখনই আপনাকে সেই অস্ত্র আনিয়া দিতেছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করিলে আমি অবশ্য সাফল্য লাভ করিব।"

রামকে প্রণাম করিয়া হনুমান প্রস্থান করিল। অন্তরালে গিয়া হনুমান এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিল। হস্তে পাঁজিপুঁথি ও কপালে দীর্ঘ ফোঁটা আঁকিয়া এক বৃদ্ধ জ্যোতিষীর বেশ ধারণ করিয়া হনুমান বাহির হইল।

অতঃপর এই জ্যোতিষী রাবণের অন্তঃপুরের নিকট গিয়া "জয় রাজা রাবণের জয়, জয় রাজা রাবণের জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, রাণী মন্দোদরী ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী দেখিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন।

ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাণী ভক্তি করিয়া তাহাকে বসিতে সিংহাসন দিলেন। বৃদ্ধ তাহাতে না বসিয়া কক্ষ হইতে কুশাসন বাহির করিয়া তাহা পাতিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—আমি জ্যোতিষ-গণনায় বড়ই পটু। চিরকাল রাবণ রাজার মঙ্গল কামনা করিয়া আসিয়াছি। ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কাল রাবণের ভাগ্য গণনা করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি।

মন্দোদরী বলিলেন—প্রভু, কি দেখিলেন অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

বৃদ্ধ—দেখিলাম, রাবণকে নিহত করা দেবতারও অসাধ্য। যে অস্ত্র তাহার ঘরে তোমার নিকট রক্ষিত আছে, তাহা কেহই জানে না। এই বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া গমনের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন—তথাপি রাণী মন্দোদরী, তুমি স্ত্রীলোক, তাই ভয় হয় ঘর-সন্ধানী বিভীষণ আবার কি জানি কি অনর্থ ঘটায়। হায়! রাবণের কথা ভাবিয়া আমি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

মন্দোদরী—প্রভু, আপনি বৃথা চিন্তা করিবেন না। বিভীষণের সাধ্য কি এই অস্ত্রের সন্ধান পায়! উহা এই স্তম্ভের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছি।

এই কথা বলা মাত্র হনুমান এক লাথিতে স্তম্ভ ভাঙিয়া ফেলিয়া মৃত্যুবাণ লইয়া 'জয় রাম' বলিয়া লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থান করিল।

মৃত্যুবাণ প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র পুনরায় রাবণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এবার আর রাবণের পরিত্রাণ নাই। ভীষণ যুদ্ধে

রামের হস্তনিক্ষিপ্ত মৃত্যুবাণে রাবণ আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

এইভাবে রাবণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে রাম একবার রাবণের নিকট গমন করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ রাবণের নিকট গমন করিলে রাবণ কাতর বাক্যে তাঁহাদের বলিলেন—মহাশয়, বহু যুদ্ধ করিয়াছি, শত শত অপরাধে আমি অপরাধী। এক্ষণে আমার মৃত্যুসময়ে সেই সকল কথা বিস্মৃত হউন।

তখন রাম বলিলেন—আপনি বিচক্ষণ রাজা, বহুদিন রাজত্ব করিয়াছেন। আমরা শিশুকাল হইতেই বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আপনি আমাদিগকে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করুন।

রাবণ বলিলেন—সংসারের সমস্ত নীতি আপনার গোচর। আপনাকে আমি আর কি রাজনীতি শিখাইব? তথাপি যখন আদেশ করিতেছেন, তখন যাহা জানি তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি।

উত্তম কার্য্য করিতে যখনি বাসনা হইবে, তখনই আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিবেন। ফেলিয়া রাখিলে সে কাজ আর সম্পন্ন হইবে না। প্রমাণস্বরূপ, একদিন স্বর্গপুরী হইতে আসিবার সময়ে যমপুরী দেখিতে পাইলাম। যমদূতেরা পাপীদিগকে যে নিদারুণ নির্য্যাতন করিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পাতকীর মুণ্ড ডুবাইয়া যমদূতেরা নিদারুণভাবে প্রহার করিতেছে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া মনে করিলাম, এই নরক-কুণ্ড ভরাট করিয়া পাপীদের দুঃখ দূর করিব এবং স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রস্তুত করিয়া দিব। কিন্তু আজ-কাল করিয়া কাজটি আর করা হয় নাই।

আর একটি বিষয় আপনাকে বলিতেছি—সৎকার্য্যে যেমন আজকাল করিয়া সময় ক্ষেপন করা উচিত নয় আবার তেমনি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানের বেলায় তখনই তাহা না করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা বিলম্বে করা কর্ত্তব্য। আমার নিজেরই কথাই বিবেচনা করুন। সীতাকে অপহরণ করার ইচ্ছা হইলে একবার ভাবিলাম, দুই-একদিন পরে যাহা হয় করা যাইবে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে হইল, হেলায় কাজটি ফেলিয়া রাখিলে হয়ত পরে আর হইবে না। এজন্য তৎক্ষণাৎ কাজটি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং আজ তাহারই ফলে আমার বংশে বাতি দিতে কেহ আর অবশিষ্ট নাই।

এই কথা বলিতে বলিতে রাবণের প্রাণ বহির্গত হইল।

সীতার বনবাস

জন্মদুঃখিনী সীতার অদৃষ্টে সুখ নাই। দুর্দ্দান্ত রাক্ষসরাজ রাবণকে নিহত করিয়া শ্রীরাম তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া কিছুকাল সুখেই বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ একদিন সীতার নিন্দা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজা রামচন্দ্র সভার মধ্যে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পাত্রগণ, আমি রাজা হওয়ার পর আপনাদের কোন বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকিলে বলুন।

সভা নিঃশব্দ—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তখন ভদ্র নামে একজন মহাপাত্র উঠিয়া রামের সম্মুখে জোড়হস্তে নিবেদন করিল—মহারাজ, রাজ্য ক্রমশঃ নির্ধন হইতেছে।

রাম বলিলেন—ইহার কারণ কি? আ।ম রাজা হইয়া কোন্ অবিচার করিলাম?

ভদ্র—মহারাজ, একথা বলিতে ভয় হয়।

রাম অভয় দিলে ভদ্র বলিল—মহারাজ, যেখানে যাই প্রজারা সীতার নিন্দা করে। তাহারা বলে, সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন। রামের তাঁহাকে গ্রহণ করা উচিত হয় নাই।

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। প্রজাপালনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। এজন্য রাজাকে যে কোন কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। রামচন্দ্র তাই অবিলম্বে সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। লক্ষ্মণ কিছুক্ষণ গভীর দুঃখে স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া নিবেদন করিলেন—আপনি নিশ্চিত জানেন, সীতার কোন অপরাধ নাই; অথচ বিনা দোষে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে অসহায় অবস্থায় বনে পরিত্যাগ করিলে আমাদের মহাপাপ হইবে। অতএব এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।

কিন্তু রামের মন টলিল না। তিনি আশ্রমে লইয়া যাইবার ছলনায় সীতাকে বনে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

আশ্রমে বেড়াইতে যাইতেছেন ভাবিয়া সীতার আনন্দের সীমা নাই। বহুমূল্য রত্নাদি ও অলঙ্কার লইয়া সীতাদেবী মহানন্দে রথে আরোহণ করিলেন।

রথ চলিতে আরম্ভ করিল। পথে নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিয়া সীতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন—বৎস, আমার মন ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছে। চল ফিরিয়া যাই, আজ আর আশ্রমে গিয়া কাজ নাই।

লক্ষ্মণ অধোমুখে বিরসবদনে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে কথা নাই, চক্ষুদুটি ঘন ঘন অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

নদী পার হইয়া বাল্মীকির তপোবনের নিকট গিয়া লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সীতা বিস্মিত হইয়া

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত নিবেদন করিলেন।

নিদারুণ আঘাতে সীতা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দরদর ধারায় অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তথাপি সীতা রামচন্দ্রের কোন নিন্দাবাদ করিলেন না। নিজের ভাগ্যের উপর সমস্ত দোষ দিয়া অরণ্যে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ

পুরাকালে রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। রাজা রামচন্দ্রও এই যজ্ঞ করিতে সংকল্প করিলেন।

অশ্বের ললাটে জয়পত্র লিখিয়া দিয়া শত্রুঘ্নকে অশ্বরক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যে রাজা সাহসী হইয়া অশ্ব ধরেন, শত্রুঘ্ন তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত বা নিহত করিয়া অশ্ব মুক্ত করেন ও এইরূপে নানাদেশের উপর দিয়া বিজয়ী হইয়া চলিতে থাকেন।

এই উপায়ে অসংখ্য রাজা রামের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই-ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে অশ্ব বাল্মীকির তপোবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে বনে পরিত্যক্তা সীতা দেবীর বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ নামে দুই পুত্র জন্মলাভ করে। বাল্মীকি চিত্রকূটে তপস্যা করিতে যাইবার সময় লব ও কুশকে তপোবন-রক্ষার ভার দিয়া যান। রামের পুত্রদ্বয় অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ

পারদর্শী। অশ্বের ললাটের জয়পত্র পড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা অশ্ব ধরিয়া রাখিল।

এদিকে অশ্বের সন্ধান করিতে করিতে শত্রুঘ্ন আসিয়া উপস্থিত। লবকুশকে সম্বোধন করিয়া শত্রুঘ্ন বলিলেন—তোমরা এখনও বালক মাত্র। দশানন-জয়ী রামচন্দ্রের যজ্ঞ-অশ্ব ধরিয়া মরিতে সাধ করিয়াছ কেন?

এই কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসিতে হাসিতে বলিল—মহাশয়, আপনি কে?

শত্রুঘ্ন—দশরথের পুত্র, আমরা চার ভাই। জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ ত্রিলোকবিজয়ী। আমি দুর্জ্জয় লবণ দৈত্যকে নিহত করিয়াছি। বীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদকে পর্য্যন্ত যুদ্ধে নিহত করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া লবকুশ বলিল—তোমরা চার ভাই আর আমরা দুই ভাই। অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, ক্ষমতা থাকে অশ্ব লইয়া যাও।

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু হায়! যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত সৈন্য হারাইয়া বীর শত্রুঘ্ন অন্তিম শয্যায় রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। বিজয়ী বালকদ্বয় বৃক্ষের সঙ্গে অশ্বটি বাঁধিয়া রাখিয়া কুটীরে প্রস্থান করিল।

অযোধ্যায় সংবাদ পৌঁছিলে ভরত ও লক্ষ্মণ বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিপুল বাহিনী রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। ভরত ও লক্ষ্মণ শিশুর হস্তে নিহত হইলেন।

ইহার পর আসিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। ভ্রাতৃগণের শোকে অধীর হইয়া রামচন্দ্র লব ও কুশের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

রামের প্রচণ্ড আক্রমণে অস্থির হইয়া দুই ভাই একবার পলায়ন করিতেও বাধ্য হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এবার লব ও কুশের বাণে রাম মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন।

কেবল হনুমান ও জাম্বুবানের মৃত্যু হয় নাই। কারণ, তাঁহারা অমর। তবে বাণের আঘাতে তাঁহারা নির্জ্জীব হইয়া রণস্থলে পড়িয়া ছিলেন।

গৃহে ফিরিবার সময়ে তাঁহাদের দেখিয়া বড়ই কৌতুক হওয়ায় লবকুশ তাঁহাদের বাঁধিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। বিরাট শরীর বলিয়া দ্বারের ভিতর দিয়া না যাওয়ায় হনুমান ও জাম্বুবানকে বাহিরে রাখিয়া দুই ভাই ঘরের ভিতর গিয়া জননীর পদধূলি গ্রহণ করিল ও তাঁহার নিকট বসিয়া যুদ্ধের বিবরণ বলিতে লাগিল—

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—ইঁহাদের সহিত আমরা ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছি। অসখ্য সৈন্য ও চারিভাই কাহাকেও প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিতে দিই নাই। আর দুর্জ্জয় দুই জন্তুকে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছি। বাহিরে আসিয়া দেখ—

জানকী মহাশোকে হাহাকার করিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন —ওরে বাছা লবকুশ, তোরা জানিস না তোরা কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস! হায়! তোরা আজ পিতৃঘাতী হইলি!—এই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সীতা তপোবনের দিকে ধাবিত হইলেন।

দ্বারের বাহিরে আসিয়া হনুমান ও জাম্বুবানকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সীতা লবকুশকে তিরস্কার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়া সীতা রামের চরণ ধরিয়া বিলাপ করিতেছেন এবং পুত্রদ্বয় লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিতেছেন, এমন সময়ে বাল্মীকি মুনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাল্মীকি সীতাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে কুটীরে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপর মন্ত্রবলে রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বাঁচাইয়া দিলেন।

মুনি শ্রীরামকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া রাজ্যে ফিরিতে বলিলেন। রাম বীর বালক দুইটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মুনি বলিলেন—মহারাজ যথাসয়ে ইহা অবগত হইবেন।

রামায়ণ গান ও সীতার পাতাল প্রবেশ

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মহামুনি বাল্মীকি লব ও কুশকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মুনি লব ও কুশকে বলিলেন—তোমরা দুইজন আমার নিকট ধনু ও সঙ্গীত-বিদ্যার শিক্ষা পাইয়াছ। ধনুর্ব্বিদ্যার অপূর্ব্ব পরীক্ষা পাইয়াছি—এবার গীতবিদ্যার কিছু পরীক্ষা দাও। কাল শ্রীরামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান করিয়া তোমরা তোমাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন কর।

রাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা বাল্মীকির শিষ্য—এইরূপ পরিচয় দিও।

পরদিন অতি প্রত্যূষে দুই ভাই স্নান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দুই শিশুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিতে রাজসভা লোকে লোকারণ্য। বালকদের কণ্ঠে মধুর গীত শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকল লোক মোহিত হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, আবার তাহাদের চেহারা অবিকল রামের মত দেখিয়া অনেকে বলিতে লাগিল—ইহারা যেন দুই শিশুরাম।

সঙ্গীতের পর পরম প্রীতিলাভ করিয়া রামচন্দ্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লবকুশ বলিল—আমরা পিতার নাম জানিনা, আমাদের মাতার নাম সীতা, আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই পরিচয় শ্রবণ করিয়া রাম বালক দুইটিকে ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাম সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য সুমন্ত্র সারথিকে রথ লইয়া বাল্মীকির আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। সীতা আগমন করিলে রাম সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু সীতা বিনাদোষে বার বার আর অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় জননী পৃথিবী দেবীকে করুণস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন—মা, যদি আমি কখনও কোন দোষে দোষী না হই, তবে হে দেবী পৃথিবী—তুমি আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও।

তন্মুহূর্ত্তে ধরিত্রী দেবী সিংহাসন লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া পাতালে অন্তর্হিতা হইলেন। রাম বৃথাই বিলাপ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী এতদিনে অন্তর্হিতা হইলেন।

একদিন রামচন্দ্র রাজসভায় রাজকার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে সংসারবিনাশী কালপুরুষ সন্ন্যাসীর বেশে রাজপুরীতে আসিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—

আমি ব্রহ্মার দূত। লক্ষ্মণ, তুমি রামকে গিয়া বল তাঁহার সহিত আমার প্রয়োজনীয় কথা আছে।

লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইয়া সন্ন্যাসীকে রাজসভায় লইয়া গেলে সন্ন্যাসী রামচন্দ্রকে বলিলেন—

আমার কথা অত্যন্ত গোপনীয়। আর কেহ যেন এই সময়ে আপনার সন্নিধানে না আসে। যদি কেহ আসে, তবে ব্রহ্মার আদেশে আপনি তাহাকে বর্জ্জন করিবেন।

রামচন্দ্র পাত্রমিত্রগণকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—লক্ষ্মণ, তুমি সতর্ক হইয়া দ্বার রক্ষা কর। দেখিও, কেহ যেন রাজসভায় না আসিতে পারে। এই সময় যে-ই আসুক, আমি সত্য করিতেছি—তাহাকেই বর্জ্জন করব।

লক্ষ্মণকে বিদায় দিয়া সন্ন্যাসী রামের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মার মায়ায় দুর্ব্বাসা রাজসভার দ্বারে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—আমাকে রামের নিকট লইয়া চল।

লক্ষ্মণ সবিনয়ে বলিলেন—যাহা করিতে হইবে, আমাকে আদেশ করুন—অগ্রজ এখন ব্রহ্মার দূতের সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত।

ইহা শুনিয়া দুর্ব্বাসার দুই চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল—আমাকে অপমান! এখনই সমস্ত অযোধ্যা নগরী ভস্ম করিয়া ফেলিব। দেখি, কাহার সাধ্য তোমাদের রক্ষা করে!

তখন লক্ষ্মণ ভাবিলেন—ভবিতব্য যাহা আছে, তাহা অবশ্য ঘটিবে। আমার জন্য সমস্ত অযোধ্যা ধ্বংস হইতে দিব না।

লক্ষ্মণ মুনিকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। কাল-পুরুষকে বিদায় দিয়া রাম দুর্ব্বাসার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনি বলিলেন—আমি উত্তম ভোজন চাই। এক বৎসর অনাহারে আছি। এক্ষণে উত্তমরূপে ভোজন করিবার জন্য তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। শ্রীরাম মুনিকে পরম পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন। তৎপরে তিনি বিষণ্ণভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সত্যরক্ষা করিতে হইলে লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিতে হয়। প্রাণ অপেক্ষা সত্য বড়।

এই সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া রামকে বলিলেন—আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও সত্যরক্ষা করুন। যে সত্যের জন্য পিতা প্রাণ দিয়া গিয়াছেন, যে সত্যরক্ষার জন্য সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, আজ আমাকেও পরিত্যাগ করিয়া সেই সত্য রক্ষা করুন।

রামচন্দ্র মৌন হইয়া রহিলেন। লক্ষ্মণ রামের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় চাহিলে রাম অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

প্রজাগণ করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। সরযূ নদীর খরস্রোতে নামিয়া লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া রাম জীবন ধারণ করিতে চাহিলেন না। লব ও কুশকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাম ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিলেন।

এইভাবে পৃথিবীতে মহত্তম দুঃখ বীরের ন্যায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াও সমস্ত জীবনে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র নরদেহ পরিত্যাগ করিলেন। রামায়ণের ন্যায় রাম ও সীতার নাম ভারতবাসীর নিকট অতি পবিত্র।
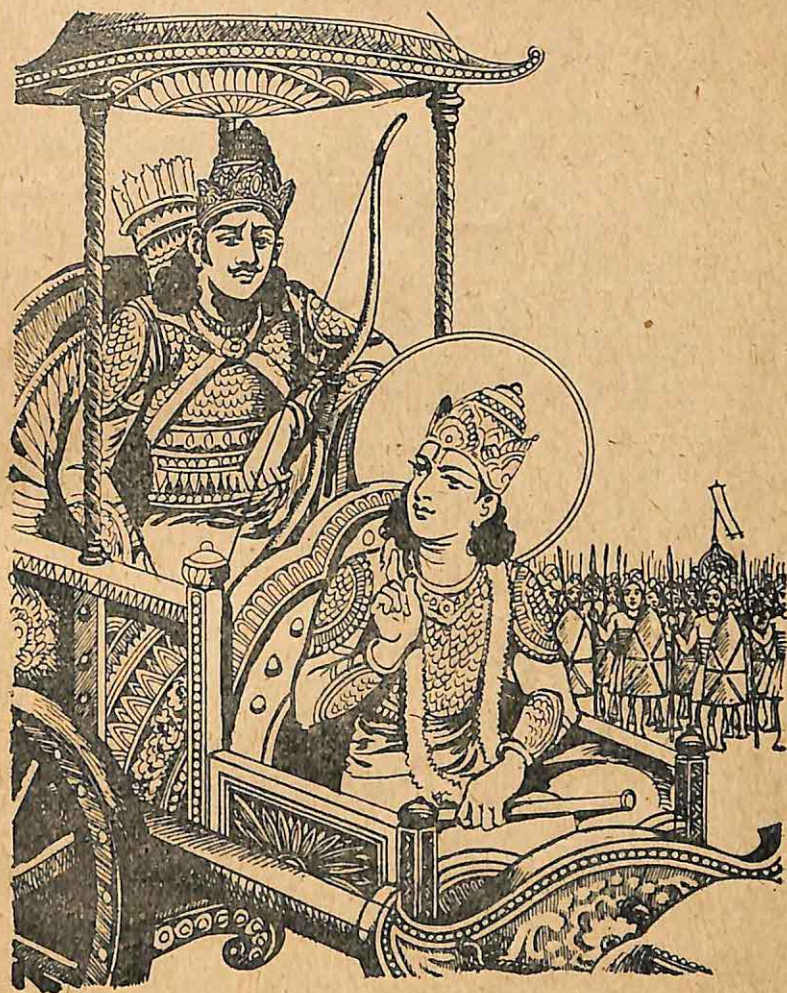
মহাভারতের কথা
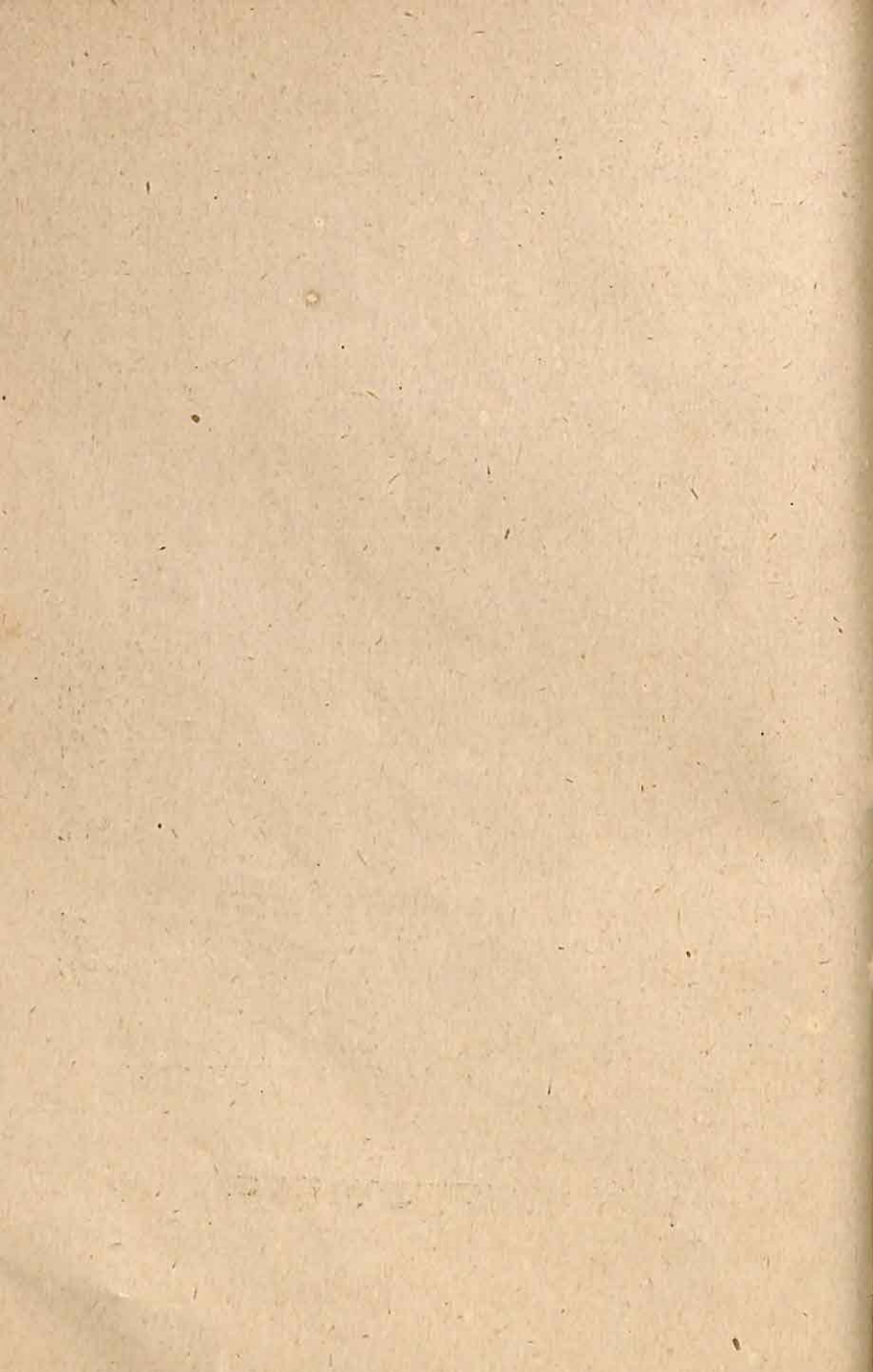
অতি প্রাচীনকালে হস্তিনা নগরীতে শান্তনু নামে এক নরপতি বাস করিতেন।

তাঁহার বীরত্বে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া গঙ্গাদেবী মর্ত্ত্যে আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। দেবব্রত নামে এক পুত্র রাখিয়া গঙ্গা স্বর্গে চলিয়া গেলে রাজা মর্ম্মাহত হইয়া কালযাপন করিতে থাকেন।

এদিকে একদিন রাজা যমুনার তীরে ভ্রমণ করিবার সময়ে এক পরমাসুন্দরী কন্যা দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এক ধীবর এই কন্যাটিকে লালন পালন করিয়াছিল। ধীবর কিন্তু কন্যাটিকে রাজার সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইল না। কারণ, রাজকুমার দেবব্রত বিদ্যমানে সত্যবতীর পুত্রের রাজসিংহাসন-লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। দেবব্রতকে বঞ্চিত করিয়া সত্যবতীর পুত্রকে সিংহাসন দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। সুতরাং রাজার কন্যাটিকে বিবাহ করা হইল না। তিনি মনের দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

পিতার মলিন মুখ দেখিয়া দেবব্রত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মন্ত্রীদের নিকট আসিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাস করিলে মন্ত্রিগণ কুমারকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

দেবব্রত বৃথা কালবিলম্ব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ধীবরের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধীবর দেবব্রতকে দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তখন দেবব্রত ধীবরকে তাহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

তখন ধীবর বলিল—মহাশয়, ইতঃপূর্ব্বে আপনার পিতাও এই কথা বলিয়াছিলেন। এখন আপনিও বলিতেছেন। কিন্তু হায়! এই কাজ হইবার নহে। সমস্তই আমার কর্ম্মফল।

দেবব্রত—কেন কর্ম্মফল?

ধীবর—মহাশয়, মহরাজ শান্তনু আমার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে! কুরুকুল বিখ্যাত বংশ, এই বংশে কন্যা দান করিব এ' ত' মহা সৌভাগ্য। তবে কিনা একটি বিষয় চিন্তা করিয়া পিছাইয়া পড়িয়াছি—

দেবব্রত—কি বিষয় বলুন, আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে নিশ্চয় ইহার প্রতীকার করিব।

ধীবর—মহাশয়, ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার ন্যায় বীর সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র বিদ্যমানে আমার কন্যার পুত্রের রাজসিংহাসন-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আমি বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইতে পারি নাই।

দেবব্রত—বুঝিতে পারিলাম। উত্তম, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—হস্তিনার সিংহাসন আমি দাবী করিব না। আমি রাজা না হইলেই আপনার কন্যার পুত্র রাজা হইতে পারিবে।

ধীবর—মহাশয় এইরূপ প্রতিজ্ঞা আপনার ন্যায় মহতেরই যোগ্য। তথাপি আর একটি কথা আছে। আপনি না হয়—সিংহাসনের দাবী পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু আপনার পুত্রেরা যদি সিংহাসন লইয়া বাদ-বিসংবাদ আরম্ভ করে।

দেবব্রত—উত্তম, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জীবনে কখনও বিবাহ করিব না। এইবার আপনি বোধ হয় নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

দেবব্রতের মহত্ত্ব দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাহার নাম হইল ভীষ্ম।

অতঃপর সত্যবতীর সহিত রাজা শান্তনুর বিবাহ গেল।

রাজা শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী—অম্বিকা ও অম্বালিকা।

অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। এইজন্য কনিষ্ঠ হইলেও অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু রাজা হইলেন। ইহাদের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্র রাজা না হইলেও তাঁহার পুত্র যদি পাণ্ডুর পুত্রের পূর্ব্বে জন্মিত, তবে সে-ই রাজা হইতে পারিত। কিন্তু পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠিরই পূর্ব্বে জন্মিলেন। তাঁহার আরো চার ভাই—ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিল। এজন্য প্রজারা সকলেই পাণ্ডুর পুত্রদের অত্যন্ত ভালবাসিত।

লোকে পাণ্ডুর পুত্রদের পাণ্ডব আর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কৌরব বলিত।

পাণ্ডবদের বাহুবল দেখিয়া দুর্য্যোধন হিংসায় জ্বলিয়া মরিত।

অনেক ভাবিয়া পাণ্ডবদের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য দুর্য্যোধন এক কৌশল অবলম্বন করিল। সে প্রচুর অর্থ দিয়া মন্ত্রীদের বশীভূত করিল।

মন্ত্রিগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বারণাবত নামক স্থানটিকে মহাতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ। মন্ত্রীদের কথা শুনিয়া একবার বারণাবত যাইয়া কিছুকাল বাস করিতে চাহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের ষড়যন্ত্র যে, না জানিতেন, তাহা নহে। পুত্রের পাপে তাঁহারও অংশ ছিল। তিনি মহাসমাদরে পাণ্ডবদের বারণাবতে যাইবার অনুমতি দিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী পুরোচনকে বাসগৃহ স্থির করিতে পাঠান হইল। তিনি সেখানে গিয়া সহজদাহ্য ঘি, চর্ব্বি ইত্যাদি মিশাইয়া সুন্দর-দর্শন এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যখন যুধিষ্ঠির বিদুরের নিকট বিদায় লইতে গেলেন, তখন বিদুর যুধিষ্ঠিরের কানে কানে ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া দিলেন। কিন্তু এখন আর না যাইয়াও উপায় নাই।

বারণাবতে পাঁচ ভাই উপস্থিত হইলে পুরোচন মহাসমাদরে তাঁহাদের জতুগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া আনিল।

পাঁচ ভাই কি উপায়ে অব্যাহতি পাইবেন পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় একব্যক্তি আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিল—

রাজকুমার, বিদুর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনাদের শয়নগৃহের নিম্ন দিয়া এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

এতক্ষণে অব্যাহতি লাভের সহজ উপায় হইল।

সুড়ঙ্গনির্ম্মাণ শেষ হইলে একদিন ভীম স্বহস্তে জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া কুন্তী ও চার ভাইকে লইয়া সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন করিল। পুরোচন সেই গৃহে অবস্থান করিতেছিল। দুষ্ট পলাইতে না পারিয়া পুড়িয়া মরিয়া নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

এদিকে ভীষণ অগ্নি দেখিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন—ইহারা সকলে গৃহদাহের সংবাদ পাইয়া মুখে হায় হায় করিয়া বহু শোক প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র একটু কাঁদিতেও ভুলিলেন না—চোখের জল ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন—হায়, রাজপুত্রদের মত সুবোধ বালকদের শেষে এ কি দশা ঘটিল! এর চেয়ে বৃদ্ধ বয়সে নিজের মৃত্যু ঘটিল না কেন?

এদিকে সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া পাঁচ ভাই দ্রুতবেগে বনের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। ভীম ছাড়া অন্য সকলেই ক্লান্ত হইয়া আর চলিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভীম জননীকে কাঁধে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে লইয়া এবং অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের হাত ধরিয়া ভীম বেগে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

পাছে আবার দুর্য্যোধনের হাতে ধরা পড়েন এই ভয়ে পাঁচ ভাই তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া একচক্রা নামক এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একচক্রাগ্রামে পাণ্ডবেরা তপস্বীর বেশে এক ব্রাহ্মণ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে ভিক্ষার দ্বারা তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিতেন।

কুন্তীদেবী ভিক্ষান্ন রন্ধন করিতেন। অর্দ্ধেক ভীমকে দিয়া বাকী অর্দ্ধেক আর সকলে ভাগ করিয়া খাইতেন। কিন্তু ইহাতেও ভীমের পেট ভরিত না। যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে ভীম বড়ই ক্লেশ পাইতেন, এইভাবে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীদেবী কালযাপন করিতে-ছিলেন এমন সময় একদিন এক ব্যাপার ঘটিল। সেদিন ভীমকে গৃহে রাখিয়া আর চার ভাই ভিক্ষার নিমিত্ত বাহির হইয়াছেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইল। সদয়-হৃদয়া কুন্তীদেবী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভীমের নিকট আসিয়া বলিলেন—বৎস, আমরা এতদিন এই ব্রাহ্মণের ঘরে কালাতিপাত করিতেছি। বিপদের দিনে এই ব্রাহ্মণ আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া পরম উপকার করিয়াছেন। হায়, আজ না জানি

তাহাদের কি অনর্থ ঘটিয়াছে! উপকারী জনের উপকার না করিলে পাপ হয়।

তখন ভীম বলিলেন—মা, তুমি জানিয়া আইস ব্রাহ্মণ কি বিপদে পড়িয়াছেন। যদি প্রাণ দিয়াও তাঁহার উপকার করিতে পারি, তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না।

ভীমের আশ্বাস পাইয়া কুন্তী ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়া দেখেন তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিতেছেন—তুমি ঘরের গৃহিণী। তোমাকে রাক্ষসের মুখে দিলে পুত্রকন্যাদের কি উপায় হইবে? তাহা অপেক্ষা আমি নিজেই রাক্ষসের নিকট গমন করি।

গৃহিণী বলিতেছেন—তুমি সংসারের কর্ত্তা, তুমি প্রাণ দিলে সমস্ত পরিবার অনাহারে মরিতে বাধ্য হইবে। অতএব তোমার যাওয়া চলিতে পারে না। আমিই যাইব।

এইরূপ বলিয়া দুইজনে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে কন্যাটি তাঁহাদের ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া বলিল—আপনারা কেহই রাক্ষসের নিকট গেলে সংসার চলিবে না, আমার এই সরল শিশু ভ্রাতাটি অনাহারে মরিয়া যাইবে। অতএব অনুমতি করুন আমি রাক্ষসের নিকট গমন করি।

তখন শিশুপুত্রটি একটি কুটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—আমি ইহার দ্বারা রাক্ষসটিকে মারিতে চলিলাম। তাহার কথা শুনিয়া অতি দুঃখের মধ্যেও সকলে না হাসিয়া পারিলেন না। এই অবসরে কুন্তীদেবী তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের দুঃখের কারণ আমাকে বলুন; সাধ্য হইলে আমি ইহার প্রতিকার করিব।

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—আমাদের দুঃখের প্রতিকার করা কোন মনুষ্যের সাধ্য নহে। এই নগরে বক নামক এক রাক্ষস আছে।

তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া নগরের লোকেরা এক ব্যবস্থা করিয়াছে। এক একদিন এক সংসারের উপর ভার পড়ে—সেই সংসারের একজন লোক একগাড়ী মিষ্টান্ন, দুইটি মহিষ ইত্যাদি ভোজ্যবস্তু লইয়া বক রাক্ষসের জন্য নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হয়। বক ভোজ্যদ্রব্যাদি ভোজন করে। বলা বাহুল্য, মানুষটিকেও বাদ দেয় না। আজ আমাদের পালা আসিয়াছে; যদি চুক্তি অনুসারে একজন লোক বকের নিকট উপস্থিত না হয়, তবে বক আমাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিবে না।

ইহা শুনিয়া কুন্তী বলিলেন—আপনি চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার জন্য আমার এক পুত্রকে বকের নিকট প্রেরণ করিব। ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—এমন কথা বলিবেন না। আপনারা আমার অতিথি, আপনাদের সর্ব্বনাশ করিলে নরকে পতিত হইব।

কুন্তী ব্রাহ্মণকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন—আমার পুত্রগণ মহাবলবান। রাক্ষস তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহারা রাক্ষসকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিবে। তখন অগত্যা ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন।

জননীর নিকট সমস্ত অবগত হইয়া ভীম মহানন্দে ব্রাহ্মণের ঘরে গমন করিলেন এবং ভোজ্য দ্রব্যাদি লইয়া বক রাক্ষসের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিলেন। বহুদিন ভীম ভালমন্দ পেট ভরিয়া খাইতে পারেন নাই। তাই দুই-চারিবার বক রাক্ষসকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া নিজেই ভোজ্যদ্রব্যাদি ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে বক রাক্ষস ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুত আসিতেছে। মানুষের এত সাহস যে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখে ভীম তাহার খাদ্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন।

তখন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভীমের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিতে লাগিল—ওরে মূর্খ, ওরে উদ্ধত, তোর এতদূর সাহস! তোর দোষের জন্য ব্রাহ্মণের ঘরের কাহারও আর রক্ষা নাই।

ভীমের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি এখন মহানন্দে পায়সান্ন শেষ করিতে ব্যস্ত আছেন। বকের কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। বক তখন মহাক্রোধে তাহার পিঠে সজোরে কিল-চড় বর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম গ্রাহ্য না করিয়া খাইতে লাগিলেন, তখন বক বড় বড় গাছ ভাঙিয়া আনিয়া ভীমের পিঠে প্রহার করিতে লাগিল। পায়সান্ন শেষ করিয়া এতক্ষণে ভীম উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ভীমের সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বক রাক্ষস প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ভ্রাতা, ভীমের আগমনের অপেক্ষায় চিন্তান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিজয়ী ভীম সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

পরদিন নগরের বাহিরে বিরাটদেহ বক রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া একচক্রা গ্রামের অধিবাসিগণ মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

দ্যূত-ক্রীড়া

পূর্ব্বকালে রাজাদের মধ্যে পাশা খেলার প্রচলন ছিল। এই পাশা খেলায় পাণ্ডবদের কি বিপদ ঘটিয়াছিল এখন সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইবে।

পাঞ্চালে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের বরণ করিয়াছেন। এইভাবে পাণ্ডবদের সন্ধান পাওয়া গেলে দুর্য্যোধন বড়ই বিমর্ষ হইলেন। তবে ত' পাণ্ডবেরা মরেন নাই। দুর্য্যোধন কিভাবে পাণ্ডবদের হত্যা করা যায়, সেই পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন।

কিন্তু বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের খাণ্ডবপ্রস্থ অর্পণ করিয়া সেখানে বাস করিতে অনুমতি দিলেন।

দেখিতে দেখিতে খাণ্ডবপ্রস্থের শ্রী ফিরিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ

পাণ্ডবদের বড় ভালবাসিতেন, তিনি ইহার নাম দিলেন ইন্দ্রপ্রস্থ।

যুধিষ্ঠির আবার রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া দুর্য্যোধনাদি সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিয়া দুর্য্যোধন হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দুর্য্যোধনের মামা শকুনি দুর্য্যোধনকে এক পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন—সংগ্রামে পাণ্ডবদের জয় করিবে, এমন কেহ পৃথিবীতে নাই। তবে আমার নিকট এক বিদ্যা আছে, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে জয় করা যায় বটে।

দুর্য্যোধন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মামা, সত্বর বল কোন্ উপায়ে পাণ্ডবদের জব্দ করা যাইবে?

শকুনি—পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির সেরূপ নিপুণ নহে। ক্ষত্রিয় রাজাদের পাশা খেলায় আহ্বান করিলে তাঁহারা বিমুখ করেন না। অতএব যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করিয়া আমি তাহার সর্ব্বস্ব জিতিয়া লইতে পারিব। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমতঃ পাশা খেলায় সম্মত হন নাই। কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইয়া মত করাইলেন, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পাঠাইয়া পাণ্ডবদের হস্তিনায় লইয়া আসিলেন।

প্রভাতে সকলে রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শকুনি পাশা হস্তে রাজসভায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠির অনিচ্ছা থাকিলেও পাশা খেলায় প্রবৃত্ত না হইয়া পারিলেন না। দুর্য্যোধন মাতুলের পক্ষে হস্তিনার ধনরত্ন ইত্যাদি পণ ধরিলে যুধিষ্ঠিরও ইন্দ্রপ্রস্থের সমস্ত ধনরত্ন পণ ধরিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন।

শকুনি অল্প সময়েই বিজয়ী হইয়া সমস্ত ধনরত্ন জয় করিয়া লইলেন।

উত্তেজিত হইয়া যুধিষ্ঠির কোটি কোটি অশ্ব পণ ধরিয়া খেলা আরম্ভ করিলে এবারও শকুনি সব জয় করিয়া লইল। অতঃপর অসংখ্য হস্তী দাস দাসী ইত্যাদি পণ ধরিয়া একে একে যুধিষ্ঠির সকলই হারিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সভামধ্য হইতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—মহারাজ, আমি অনুরোধ করিতেছি, এখনও নিবৃত্ত হউন। আপনি কি বৃদ্ধকালে হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন? কিন্তু দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া বিদুরকে অপমানসূচক বাক্য বলিয়া নীরব করাইলেন।

এবার শকুনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন--সমস্তই ত' হারাইলে; এবার কি পণ রাখিবে?

যুধিষ্ঠির বলিলেন—গাভী, উষ্ট্র, মহিষ এবং আমার শাসিত সমস্ত জনপদ পণ রাখিলাম।

খেলা আরম্ভ হইলে শকুনি পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত জয় করিয়া লইলেন।

ইহার পর নকুল, সহদেব, ভীম, অর্জ্জুন এবং নিজেকেও পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠির হারিয়া গেলেন। তখন মৃদু হাসিয়া শকুনি বলিলেন—এবার দ্রৌপদীকে পণ রাখ।

যুধিষ্ঠির তাহাই রাখিলাম বলিয়া পাশায় দান দিলেন।

ভীষ্ম ও দ্রোণ সজল নয়নে সভায় বসিয়া, বিদুর ম্লান মুখে নীরব হইয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠির এবারও পরাজিত হইলেন। তাঁহার আর কিছুই নাই, এতক্ষণে পাশা খেলা সমাপ্ত হইল।

পাণ্ডুপুত্রগণ এখন আর রাজা নহেন। তাঁহারা কৌরবদের

কেনা গোলাম। তাঁহাদিগকে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করা স্থির হইল। দুঃশাসন যুধিষ্ঠিরকে নির্দ্দয়ভাবে ঠেলা মারিয়া লইয়া চলিল। যুধিষ্ঠিরের অবস্থা দেখিয়া ভীম মহাক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আদেশ না পাওয়ায় কোনই প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না!

ইহার পর কুরুসভায় পাণ্ডবদের প্রতি নানারূপ জঘন্য অত্যাচার করা হইল। দুর্য্যোধনের আদেশ পাইয়া দুঃশাসন দ্রৌপদীকে রাজসভায় ধরিয়া লইয়া আসিল।

দুঃশাসন এখন সতীনারীর প্রতি নানাপ্রকার অসম্মানসূচক বাক্য বলিতে লাগিল। দ্রৌপদী করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে থাকিয়া গান্ধারী দ্রৌপদীর করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পুত্রদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। এই সময়ে নানাপ্রকার অমঙ্গলের চিহ্নও দেখা গেল। যাহা হউক, ধৃতরাষ্ট্র গিয়া দ্রৌপদীকে অব্যাহতি দিলেন। তিনি পঞ্চপাণ্ডবকে সমস্ত পণ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

পণ হইতে মুক্ত হইয়া পঞ্চভ্রাতা ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেলে দুর্য্যোধন বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

হায় এত করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ রাজার জন্য সমস্তই নষ্ট হইল! তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আবার তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন—পিতঃ, পাণ্ডবেরা কি আমাদের ছাড়িয়া দিবে মনে করিয়াছেন? তাহারা আমাদের হস্তে যে অপমান পাইয়াছে, আমাদের হত্যা না করিয়া তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। অতএব ছল করিয়া আবার তাহাদের সহিত পাশা খেলিয়া এবার তাহাদের দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইব।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ। এই পরামর্শ তাঁহার ভালই মনে

হইল। তাঁহার আদেশে পুনরায় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ উপস্থিত হইলে শকুনি বলিলেন—অন্ধরাজার আজ্ঞায় পাশাখেলা আরম্ভ হউক। এবার সর্ত্ত হউক—যে হারিবে, সে দ্বাদশবৎসর বনে কাটাইবে। আরও একবৎসর তাহাকে অজ্ঞাতবাসে কাটাইতে হইবে। যদি অজ্ঞাতবাসের বৎসর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় তবে আরও দ্বাদশ বৎসর বনে কাটাইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, ধর্ম্মরাজ পরাজিত হইলেন। দুর্য্যোধনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া গেলেন।

যে সময়ে হস্তিনার রাজা দুর্য্যোধন মহা আড়ম্বরে রাজত্ব করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণাসহ পঞ্চপাণ্ডব কাম্যকবনে প্রভাসতীর্থের তীরে বাস করিতেছিলেন।

কিন্তু তথাপি দুর্য্যোধনের মনে শান্তি ছিল না ; কারণ, তাঁহার এই সম্পদবৈভব শত্রুরা ত কেহই দেখিতে পাইল না।

অবশেষে শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে দুর্য্যোধন অশ্ব, হস্তী ও রথ ইত্যাদি লইয়া সপরিবারে মহা আড়ম্বরের সহিত প্রভাস যাওয়া স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন এইভাবে তীর্থ করাও হইবে, আবার পাণ্ডবদের নিজেদের ঐশ্বর্য্যও দেখান হইবে। ভীষ্ম-দ্রোণকে না লইয়া দুর্য্যোধন বহু সৈন্যসামন্ত ও নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের লইয়া—মহা আড়ম্বরে প্রভাসের দিকে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পথে তাঁহাদের এক বিপত্তি ঘটিল। প্রভাসের পথে চিত্রসেন নামক এক গন্ধর্ব্বের এক উদ্যান ছিল। দুর্য্যোধনের

সৈন্যসামন্ত প্রভাসে যাইবার পথে উদ্যানের গাছপালা ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিতে লাগিল।

উদ্যানের রক্ষক আসিয়া প্রতিবাদ করিলে কর্ণ তাহাকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

রক্ষী সেখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া চিত্রসেনের নিকট সকল নিবেদন করিল।

সমস্ত শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্ব চিত্রসেন মহাক্রোধে রণসাজে সজ্জিত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু দুর্য্যোধনের সৈন্যসামন্ত চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। স্বয়ং কর্ণ বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন। শেষে সকলেই দুর্য্যোধন ও নারীদের পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

চিত্রসেন দুর্য্যোধন ও নারীদের বন্দী করিয়া রথে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবিপদে পতিত হইয়া রমণীগণ করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের বীর পাণ্ডু-পুত্রদের কথা মনে পড়িল। অনেক ভাবিয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত দ্রুত আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট নিবেদন করিল—মহারাজ! চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধন ও কুরুনারীদের বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিপন্ন হইয়া আপনার ভ্রাতৃবধূগণ আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি এই দুঃসময়ে তাঁহাদের মানসম্মান রক্ষা করুন।

সমস্ত শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনাদির রক্ষার্থে যাত্রা করিতে বলিলেন।

কিন্তু ইহাতে ভীম বিশেষ প্রীত হইলেন না, তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন—আপনি ধর্ম্ম-অবতার, তাই আমাদের এত কষ্ট,

নচেৎ দুষ্ট উচিত প্রতিফল পাইয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে আবার আমরা চেষ্টা করিব কেন ?

যুধিষ্ঠির ভীমকে বুঝাইলেন—আমরা নিজেদের মধ্যে যতই বিবাদ করি না কেন, অন্যে যখন আমাদের কাহাকেও আক্রমণ করিবে, তখন আমরা একশত পাঁচ ভাই।

অর্জ্জুন রণসাজে সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিলেন। পথে চিত্রসেনের সহিত তাঁহার দেখা হইল। চিত্রসেন অর্জ্জুনকে বলিলেন—"অর্জ্জুন, আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, এই দুর্য্যোধন চিরদিন তোমাদের হিংসা করিয়াছে—অথচ আজ কিনা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ !"

অর্জ্জুন বলিলেন—"আপনি আমাদের কুলবধূগণকে লইয়া গেলে বংশে কলঙ্ক হইবে। কুলের কলঙ্কে কুলাঙ্গারগণই সুখী হয় জানিবেন।"

অতঃপর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ পরে চিত্রসেন অর্জ্জুনের হস্তে বন্দী হইলেন। অর্জ্জুন বন্দী চিত্রসেন ও দুর্য্যোধনাদি সকলকে লইয়া একেবারে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির চিত্রসেনকে মুক্ত করিয়া দিয়া মিষ্ট কথায় বিদায় দিলেন। পরে দুর্য্যোধনের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া নানাবিধ সদুপদেশ দান করিলেন। দুর্য্যোধন রমণীদের লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের হিংসা কমিল না। গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল কি উপায়ে পাণ্ডবদের বিপদে ফেলা যায়। শীঘ্র এক সুযোগও মিলিয়া গেল। সে কথা তোমাদের পরে বলিব।

একদিন দুর্ব্বাসা মুনি দশসহস্র শিষ্য লইয়া দুর্য্যোধনের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। দুর্যোধন ভাবিলেন, এই মহাক্রোধী মুনিকে যদি একবার পাণ্ডবদের নিকট বনে প্রেরণ করা যায়, তবে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় তাঁহার আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবে না, আর মুনিও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের নিশ্চিত ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। এই ভাবে আমার শত্রু নিপাত যাইবে।

দুর্য্যোধনের আতিথেয়তায় দুর্ব্বাসা সন্তুষ্ট হইলে তিনি মুনিকে বলিলেন—"আপনি একদিন রাত্রিকালে অসময়ে শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের আতিথ্য গ্রহণ করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।"

সূর্য্যদেব দ্রৌপদীকে একটি অদ্ভুত পাত্র দিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই পাত্র সর্ব্বদা নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ থাকিত এবং তাঁহার আহারের পর তাহাতে আর

কিছুই থাকিত না। রাত্রিতে দ্রৌপদীর আহারের পর দুর্ব্বাসা শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য গিয়া উপস্থিত হইলে, সেদিন অতিথি সৎকার করিবার কোন উপায়ই পাণ্ডবদের থাকিবে না এবং সে কারণে অতিশয় ক্রুদ্ধস্বভাব মুনির অভিশাপে পাণ্ডবেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন—ইহাই ছিল দুর্য্যোধনের শিষ্যগণসহ দুর্ব্বাসাকে অসময়ে পাণ্ডবদের নিকট প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের অনুরোধে সম্মত হইলেন এবং একদিন রাত্রিকালে অসময়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরা ভিক্ষান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন সমাপ্ত করিয়াছেন। দ্রৌপদীরও আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘরে কিছুই নাই। এই সময়ে দশসহস্র শিষ্য লইয়া মহাক্রোধী মুনি দুর্ব্বাসা গিয়া উপস্থিত। যুধিষ্ঠির মহাসমাদরে মুনিকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অসময়ে শিষ্যগণসহ মুনির আগমনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন—"মহারাজ, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। নদীতে স্নানাহ্নিক করিয়া আসিতেছি, তুমি আহারের আয়োজন কর।" এই বলিয়া মুনি শিষ্যদিগকে লইয়া নদীতে স্নান করিতে গেলেন।

যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দেখিয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি পাণ্ডবদের বিপদ দেখিয়া অমনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলিলেন—দেখ হাঁড়িতে কি আছে?

দ্রৌপদী—দুটি মাত্র শাকান্ন আছে।

শ্রীকৃষ্ণ—তাহাই আমাকে দাও। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই মুখে দিয়া 'তৃপ্ত হইয়াছি' বলিয়া একটি উদ্গার তুলিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হইল, অমনি নদীতীরে দশসহস্র শিষ্যসহ

দুর্ব্বাসারও উদর ভরিয়া গেল। তাহাদের আর বিন্দুমাত্র ক্ষুধা নাই। চলিবারও ক্ষমতা নাই। যে যেখানে পারিল নদীতীরে শয়ন করিল।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে ভীম মুনিদের সন্ধানে গেলেন—"মুনিগণ, কোথায়? আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে, আপনারা আসুন।" ভীমের ডাক শুনিয়া শিষ্যরা বড়ই প্রমাদ গণিলেন। কাহারও খাওয়ার মতো অবস্থা নয়, অথচ নিজেরা খাওয়ার কথা বলিয়া এখন না গেলে ভীমের হাত হইতে পরিত্রাণেরও উপায় নাই। তাঁহারা দুর্ব্বাসার পরামর্শ চাহিলেন। দুর্ব্বাসার নিজের অবস্থাও সুবিধার নহে। বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া তিনি কৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। তখন কৃষ্ণ আসিয়া ভীমকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "এখন মুনিদের নিদ্রার বিঘ্ন করিবার প্রয়োজন নাই।"

শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করায় সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনিও রক্ষা পাইলেন।

পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশবৎসর শেষ হইয়াছে। এক্ষণে একবৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইতে হইবে। বিরাটরাজ খুব সজ্জন। পাণ্ডবেরা স্থির করিলেন অজ্ঞাতবাসের সময়টি তাঁহারা ছদ্মবেশে বিরাট-রাজগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

পাঁচ ভাই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বিরাটরাজের নিকট উপস্থিত হইলে বিরাটরাজ সাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের নাম হইল 'কঙ্ক', তিনি নিজেকে পাশা খেলায় খুব পটু বলিয়া পরিচয় দিলেন।

ভীম রন্ধনশালার ভার নিলেন এবং 'বল্লভ' নামে নিজের পরিচয় দিলেন। অর্জ্জুন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি 'বৃহন্নলা' নাম গ্রহণ করিয়া রাজকন্যা উত্তরাকে গানবাজনা শিখাইতে নিযুক্ত হইলেন। 'গ্রন্থিক' ও 'তন্ত্রিপাল'রূপে নকুল ও সহদেব

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দ্রৌপদী 'সৈরিন্ধ্রী' নামে পরিচয় দিয়া অন্তঃপুরে রাণীর সহিত থাকিলেন।

এইভাবে পঞ্চপাণ্ডব অতি সামান্য লোকের ন্যায় বিরাটরাজের গৃহে কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে এক বিপত্তি ঘটিল। বিরাটরাজের সেনাপতি ও শ্যালক কীচক সৈরিন্ধ্রীকে নানাভাবে অপমান করিতে লাগিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীম এক রাত্রে কীচককে হত্যা করিয়া রাখিল।

এদিকে কৌরবেরা বহুদিন ধরিয়া পাণ্ডবদের সন্ধান করিয়া না পাইয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কয়েকজন মনে করিলেন যে, বনের মধ্যে তাঁহারা নিশ্চয় মারা গিয়াছেন।

কীচকের মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র হইলে ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনকে এই সময়ে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিয়া গো-হরণ করিবার পরামর্শ দিলেন। দুর্য্যোধন তাহাতে সম্মত হইয়া একযোগে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিলেন।

সুশর্ম্মা বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া বিরাটরাজ্যের একদিক আক্রমণ করিলেন।

বিরাটরাজ রাজ্যের সমস্ত যোদ্ধা লইয়া তাঁহাকে দমন করিতে গেলেন। দ্বিতীয় পুত্র উত্তর ব্যতীত রাজ্যে আর কোন যোদ্ধা থাকিল না। এমনকি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবও রাজার সহিত চলিলেন।

সুশর্ম্মা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বিরাটরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন—"দেখ, এই রাজা বিপদের সময় আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। এখন বিপন্ন হইলে যদি আমরা সাহায্য না করি, তবে বড়ই অন্যায় হইবে। তুমি যেরূপে পার,

উহাকে উদ্ধার কর, কিন্তু সাবধান, কেহ যেন তোমাকে চিনিতে না পারে।”

ভীম ত' আদেশ পাইয়া মহাখুশী। তখনই বড় বড় তুই গাছ উপড়াইয়া সুশর্ম্মার সৈন্যদের তাড়া করিয়া যমালয়ে পাঠাইয়া দিলেন এবং বিরাটরাজকে মুক্ত করিয়া সুশর্ম্মাকে বাঁধিয়া নিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট হাজির হইলেন। যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি মুখ নীচু করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিরাটরাজ মুক্তি পাইয়া ভীমের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে আর এক বিপদ। সুশর্ম্মা যে সময়ে রাজ্যের একদিক আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কৌরবেরা অন্য একদিক আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা শত শত গোয়ালাকে তাড়াইয়া দিয়া সহস্র সহস্র গরু লইয়া চলিয়া যাইতেছেন সংবাদ পাওয়া গেল। রাজ্যে তখন রাজার দ্বিতীয় পুত্র উত্তর ছাড়া পুরুষ যোদ্ধা কেহ ছিল না।

উত্তর নারীদের নিকট খুব গর্ব্ব করিতে লাগিলেন—“আমি একাই কৌরবদের যমালয়ে পাঠাইতে পারিতাম। তবে কি করিব, রাজ্যে এমন একজন সারথি নাই, যে আমার রথ চালনা করে। একজন সারথি পাইলে আজ একবার কৌরবদের দেখিয়া লইতাম।”

দ্রৌপদী এই সমস্ত শুনিয়া উত্তরাকে জানাইলেন—“তুমি গিয়া উত্তরকে বল, বৃহন্নলা সারথির কাজে পটু। সে একবার অর্জ্জুনেরও রথ চালনা করিয়াছিল।” উত্তরা তৎক্ষণাৎ গিয়া ভ্রাতাকে সমস্ত বলিল। উত্তর আর কি করেন সম্মত না হইয়া উপায় নাই।

অর্জ্জুন আসিয়া সারথি হইতে সম্মত হইলেন, তবে তিনি বলিলেন—“আমার একটি সর্ত্ত আছে। যুদ্ধে জয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমি রণস্থল হইতে রথ ফিরাইতে পারিব না।”

উত্তর গিয়া রথে চড়িলে, বৃহন্নলা রথ চালনা করিতে লাগিলেন রথ যতই অগ্রসর হয়, ততই উত্তরের বুকের মধ্যে কাঁপিতে থাকে। অবশেষে যখন দূরে সমুদ্রের ন্যায় অসংখ্য কৌরবসেনা দেখা গেল, তখন উত্তর অর্জ্জুনকে রথ থামাইতে বলিয়া বলিলেন—"চল, ফিরিয়া যাই। আর যুদ্ধে কাজ নাই।"

অর্জ্জুন তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া রথ চালনা করিতে লাগিলেন। তখন উত্তর আর কি করেন; রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন রথ থামাইয়া ভূমিতে নামিয়া তাঁহার পিছনে পিছন দৌড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন।

উত্তর সকাতরে অর্জ্জুনকে বলিলেন—"ওগো! বৃহন্নলা, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও। তুমি যাহা চাও তাহাই দিব।"

অর্জ্জুন—"তোমায় যুদ্ধ করিতে হইবে না। আমিই যুদ্ধ করিব। তুমি সারথির কার্য্য কর।" এই বলিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে রথে তুলিলেন।

একটি শমীবৃক্ষের নিকট আসিয়া অর্জ্জুন উত্তরকে বৃক্ষে উঠিতে বলিলেন।

অর্জ্জুনের নির্দ্দেশে উত্তর একটি বিরাট অস্ত্রের বোঝা বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া আনিলেন। এইরূপ ভীষণদর্শন অস্ত্র উত্তর জীবনে দেখেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এগুলি কাহার অস্ত্র ?"

অর্জ্জুন—পাণ্ডবদের।

উত্তর—তুমি কোথায় পাইলে ?

এতক্ষণে অর্জ্জুন নিজের পরিচয় দিলেন, সমস্ত জানিয়া উত্তরের ভয় দূর হইল। তিনি মহা উৎসাহে রথ চালাইতে লাগিলেন।

তারপর আরম্ভ হইল মহাযুদ্ধ। অর্জ্জুন অস্ত্রদ্বারা প্রথমে ভীষ্ম ও দ্রোণের পদবন্দনা করিলেন। অতঃপর অবিরত বাণ-বর্ষণে

কৌরবসৈন্যদিগকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। তাহারা তখন গরু ফেলিয়া দলে দলে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। তখন অর্জ্জুন সম্মোহ বাণ দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে হতচেতন করিয়া রাখিয়া গরুগুলি উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। রাজপুরীতে ফিরিবার পূর্ব্বে শমীবৃক্ষে অস্ত্রশস্ত্রগুলি রাখিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা ও পাণ্ডবদের পরিচয় দান

বিরাটরাজ সংবাদ পাইয়াছেন, যে, উত্তর গিয়া গোধন উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া সমস্ত রাজ্যে উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র উত্তরের বীরত্বের তুলনা কোথায়! সে একা শত শত কৌরবকে পরাস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তিনি আনন্দের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—কঙ্ক, আজ বড়ই আনন্দের দিন। আইস, একদান পাশা খেলা যাউক। পাশা খেলিতে খেলিতে বিরাটরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—"উত্তর কি বীর! একাই শত শত কৌরবকে হারাইয়া দিয়াছে।"

যুধিষ্ঠির—"মহাশয়, বৃহন্নলা যাহার সঙ্গে আছে, কাহার সাধ্য তাহাকে পরাজিত করে!" বলা বাহুল্য, রাজা এই কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় রাজা বলিলেন—"উত্তর যে বড়

বীর, তাহা আমিও জানিতাম না। আজ আমি তাহার জন্য গর্ব্ববোধ করিতেছি। সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে।" যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহাশয়, বৃহন্নলা যাহার সঙ্গে আছে, সে না করিতে পারে এমন কাজ কি আছে!"

এইরূপে রাজা যতবার উত্তরের প্রশংসা করেন, যুধিষ্ঠির ততবারই বৃহন্নলার কৃতিত্বের উল্লেখ করিতে থাকেন।

তখন রাজা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বার বার কিনা সামান্য বৃহন্নলার প্রশংসা! উত্তর যে এতবড় যুদ্ধ জয় করিল, তাহার নামও উল্লেখ করেন না। মহারাজ ক্রোধে অন্ধ হইয়া পাশা ছুঁড়িয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রহার করিলেন। দর দর ধারায় যুধিষ্ঠিরের মস্তক হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির হাত পাতিয়া রক্ত ধরিলেন, মাটিতে পড়িতে দিলেন না, কারণ যুধিষ্ঠিরের রক্ত মাটিতে পড়িলে বিরাটরাজ ধ্বংস হইয়া যাইতেন।

ঠিক সেই সময় উত্তর সেইখানে উপস্থিত হইয়া—কঙ্কের অবস্থা দেখিয়া 'হায়' 'হায়' করিয়া উঠিলেন। "এমন সর্ব্বনাশ কে করিল"—বলিয়া উত্তর মহাব্যস্তে কঙ্কের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বিরাটরাজ সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিলে উত্তর সবিনয়ে বলিলেন—"পিতা, আমি যুদ্ধ জয় করি নাই। এক দেবতাসদৃশ মানুষ আমার হইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া দিয়াছেন। আপনি শীঘ্রই তাঁহার দর্শন পাইবেন।"

এক্ষণে পাণ্ডবেরা গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহারা বিরাটরাজকে তাঁহাদের পরিচয় দান করিবেন স্থির করিলেন।

অতি প্রাতঃকালে স্নান করিয়া যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে বিরাটরাজ রাজসভায় প্রবেশ করিলেন—সমস্ত দেখিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"কঙ্ক, তোমার একি ব্যবহার! তুমি আমার সিংহাসনে বসিয়াছ কেন?"

অর্জ্জুন বলিলেন—"মহারাজ, স্বয়ং ইন্দ্র যাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, আপনি কি তাঁহাকে সম্মান করিতে ইচ্ছুক নহেন?"

তখন উত্তর পিতাকে পঞ্চপাণ্ডবের পরিচয় দিয়া অর্জ্জুনকে দেখাইয়া বলিলেন—"পিতা, ইনিই সেদিন আমার হইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া দিয়াছিলেন।"

রাজা বিস্ময়ে ও আনন্দে কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে না জানিয়া পাশা দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। এজন্য বার বার যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"মহাশয়, আমি তখনই আপনাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, নতুবা আমার রক্ত মাটিতে পড়িলে আপনার সর্ব্বনাশ ঘটিত! আপনি আমাদিগকে আতিথ্য দিয়া যে উপকার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব জানিবেন।"

বিরাটরাজ বলিতে লাগিলেন—"আমার এমন কি পুণ্য ছিল জানি না যে, আপনাদের ন্যায় বীর ধার্ম্মিকদের পদধূলির দ্বারা আমার রাজপুরী পবিত্র হইয়াছে। যদি এতই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তবে আর একটি প্রার্থনা পূরণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি।

অর্জ্জুন বলিলেন—আমি এতদিন উত্তরাকে কন্যার ন্যায় লেখা-পড়া শিখাইয়াছি। অতএব আমার পুত্র অভিমন্যুর সহিত তাহার বিবাহ দিব।

নির্দ্দিষ্টদিনে উত্তরা ও অভিমন্যুর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। এইভাবে পাণ্ডবদের আতিথ্য দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ বিরাটরাজ পাণ্ডবদের সহিত আত্মীয়তা করিতে সমর্থ হইলেন।

অভিমন্যুর বীরত্ব

অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবেরা হস্তিনায় দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

দূত ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল—দুর্য্যোধন বলিয়াছেন, তিনি বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমিও দিবেন না। তখন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। যুধিষ্ঠির শান্তিপ্রিয়। তিনি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের সহিত পরামর্শ করিয়া একদিন শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া পঞ্চপাণ্ডবের জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন। দুষ্ট দুর্য্যোধন কেবল যে শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণকে যথেষ্ট অপমান করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। তখন যুদ্ধ ছাড়া আর গত্যন্তর থাকিল না।

যুদ্ধের সময় বড় বড় রাজা কেহ বা পাণ্ডবের পক্ষে কেহ বা কৌরবের পক্ষে যোগ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিলেন। কথা হইল, তিনি অস্ত্র ধরিবেন না, কেবল অর্জ্জুনের রথে সারথির কাজ করিবেন। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি দুর্য্যোধনকে অসংখ্য নারায়ণী সেনা দিলেন।

ভীষণ যুদ্ধে কত সৈন্য কত রাজা-মহারাজা যে প্রাণ দিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মহাবীর ভীষ্ম লক্ষ লক্ষ শরবিদ্ধ হইয়া শরের শয্যায় রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন।

ভীষ্মের পরে দ্রোণ কৌরব-পক্ষে সেনাপতি হইলেন। এই সময়ে একদিন অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সংশপ্তকেরা আসিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধের জন্য দূরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এদিকে দ্রোণ চক্রব্যূহ নামে এক অদ্ভুত ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অর্জ্জুন ও তাঁহার পুত্র অভিমন্যু ছাড়া অন্য কেহই এই ব্যূহে প্রবেশ করিবার কৌশল জানিতেন না। অভিমন্যু কেবল প্রবেশের কৌশলই জানিতেন, ব্যূহ হইতে বাহির হইবার উপায় জানিতেন না। তখন যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে ডাকিয়া বলিলেন—বৎস, আমরা কেহই এই ব্যূহ-প্রবেশের উপায় করিতে পারিতেছি না। তুমি যদি জানিয়া থাক, তবে অদ্যকার যুদ্ধের সেনাপতির পদ তোমাকেই প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

অভিমন্যু সবিনয়ে বলিলেন—আমি এই ব্যূহে প্রবেশ করিতে জানি বটে, তবে ইহার বাহিরে আসিবার কৌশল আমার জানা নাই।

তখন ভীমসেন উত্তর করিলেন—তাহার জন্য চিন্তা করিও না। তুমি একবার মাত্র ভিতরে যাইবার কৌশল দেখাইয়া দাও। তোমার পিছনে পিছনে গিয়া মূর্খ কৌরবদের গদাঘাতে চূর্ণ করিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু পিতারই

ন্যায় বীর, যুদ্ধে ভীত হইবার পাত্র নহেন। তিনি অনতিবিলম্বে রণসাজে সজ্জিত হইয়া অতি দ্রুত চক্রব্যূহ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। রাজা জয়দ্রথ ব্যূহমুখ রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরাজিত করিয়া অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে রথ লইয়া গেলেন। কিন্তু হায়! গদা হস্তে ভীম অভিমন্যুর পিছনে ধাবিত হইলেন বটে, কিন্তু জয়দ্রথের হস্তে পরাজিত হইয়া ব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

ভাগ্য বিরূপ হইলে সমস্তই সম্ভব হইতে পারে। জয়দ্রথের হস্তে পাণ্ডবেরা একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন! হায়! এমন সময় অর্জ্জুন যদি থাকিতেন! কিন্তু অর্জ্জুন তখন নারায়ণী সেনার সহিত ভীষণ যুদ্ধে ব্যস্ত। পাণ্ডবেরা বার বার জয়দ্রথের হস্তে পরাজিত হইয়া ক্রোধে চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন। হায়! বালক অভিমন্যু একাকী লক্ষ লক্ষ কৌরবের সহিত কি উপায়ে যুদ্ধ করিবেন!

এদিকে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অভিমন্যু বীরবিক্রমে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, তাহার তুলনা হয় না। একা এই বালকের শরাঘাতে কৌরব সেনার মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। কুমারের প্রতাপ ও নিজের সৈন্যদের অবস্থা দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সেদিন কৌরবদের বহু বড় বড় যোদ্ধা অভিমন্যুর হস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন।

দুর্য্যোধন দ্রোণের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। দ্রোণ বলিলেন—ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুকে পরাভূত করিতে পারে, এমন কেহই নাই।

দুর্য্যোধন তখন যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া একসঙ্গে সপ্তরথী মিলিয়া বীর বালককে আক্রমণ করার সঙ্কল্প করিলেন।

দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরেরা এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু দুর্য্যোধন বলিলেন—আজ ইহা ছাড়া উপায় নাই। এইভাবে অভিমন্যুকে নিহত না করিতে পারিলে সে আজই আমাদের সকলকেই নিহত করিয়া যাইবে।

সপ্ত মহারথী একই সঙ্গে বালক অভিমন্যুকে ঘিরিয়া ফেলিল। যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া অভিমন্যু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ভীত হইলেন না। তিনি একই সঙ্গে সাতজনের উপর তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পরাজিত হইয়া সাতজনই পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে সাতবার পরাজিত হইয়া সাতবারই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অবশেষে কর্ণের পরামর্শে সপ্তরথী একসঙ্গে শর নিক্ষেপ করিয়া কেহ ধনুক, কেহ গুণ, কেহ রথ, কেহ তূণ সমস্ত কাটিয়া বালককে অসহায় করিয়া ফেলিল।

রথ ও ধনুক কাটা গেলে বীর বালক রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রথের চাকা লইয়া ভীমবিক্রমে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইভাবে আর কতক্ষণ যুদ্ধ করা চলে! অসংখ্য অস্ত্রাঘাতে কাতর হইয়া বীর বালক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে স্মরণ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেলেন, এমন সময়ে দুঃশাসনের পুত্র ছুটিয়া আসিয়া গদার দ্বারা মূর্চ্ছিত অভিমন্যুর উপর আঘাত করিতে লাগিল।

অন্যায় যুদ্ধে বীর অভিমন্যু এইভাবে নিহত হইলেন। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। সেদিনের মত যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

মহাযুদ্ধের পর

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইল। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে কয়েকজন ছাড়া অসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও রাজন্যবর্গ এই যুদ্ধে নিহত হইল। অষ্টাদশদিন মহাযুদ্ধের পর কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হইল। ঘরে ঘরে পুত্রহীনা মাতা ও স্বামীহীনা বিধবার ক্রন্দনে হাহাকার উঠিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একটি পুত্রও বাঁচিয়া নাই। পুত্রশোকে অধীর হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের জলে ধরণী সিক্ত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—হায় বৃদ্ধকালে পুত্রদের হারাইলাম! বন্ধুবান্ধবদের কেহই আর থাকিল না। আমি দেশান্তরী হইব। আমার মত দুঃখী আর কেহ নাই, আমার মরাই ভাল।

সহচর তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন—মহারাজ আপনার কিছুই অজানা নাই; দুর্য্যোধন নিজের পাপেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আপনিও স্নেহান্ধ হইয়া তাঁহার

পাপের প্রশ্রয় দিয়াছেন। পাশা খেলার কথা স্মরণ করুন; স্মরণ করুন, পাণ্ডবেরা মাত্র পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাও দিতে স্বীকৃত হন নাই। যাহা হউক, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন, আপনি তাহাদের জন্য বৃথা শোক করিবেন না।

অতঃপর আত্মীয়স্বজনদের প্রেতকৃত্য সমাপন করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রে গমন করিতে চাহিলেন। বিদুর অন্তঃপুরে গিয়া গান্ধারীকে ডাকিতে গেলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরের রমণীগণ করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

গান্ধারী তাঁহাদের ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া রথে আরোহণ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বড়ই লজ্জিত হইলেন।

হায়! গান্ধারীই বা কি বলিবেন? তাঁহাদের বেদনা অনুভব করিয়া যুধিষ্ঠির বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, পাঁচভাই আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রের চরণে পতিত হইলেন। পাঁচভাই রাজার নিকট বসিলে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—ভীম কোথায়? তুমি আমার শতপুত্র বধ করিয়া পিণ্ডের প্রয়োজন ঘুচাইয়াছ। মর্ম্মাহত হইলেও তোমার বীরত্বে তুষ্ট হইয়াছি। আইস, তোমাকে আলিঙ্গন করি। এই বলিয়া অন্ধ রাজা হাত বাড়াইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই একটি লোহার ভীম তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই রাজার সম্মুখে ধরিলে ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহ-ভীমকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার দেহে অযুত হস্তীর শক্তি ছিল। লৌহভীম চূর্ণ হইয়া মাটিতে পড়িল। তখন ধৃতরাষ্ট্র কপট শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন ইহা শুনিয়া

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আপনি চিন্তা করিবেন না, ভীম কুশলেই আছেন। আপনার ক্রোধ অনুমান করিয়া আমি আপনাকে লৌহের ভীম দিয়াছিলাম। হে নৃপতি! আপনি ভীমকে মারিলে দুর্য্যোধনকে পাইবেন না। অতএব, ক্রোধ প্রশমিত করুন।

অতঃপর পঞ্চভ্রাতা গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন। গান্ধারীর অন্তরে কোনদিন কোন বিদ্বেষ ছিল না। এমন কি, যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন যখন তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাহিতে যান, তখনও গান্ধারী বলিয়াছিলেন—যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেরই জয় হউক। তিনি শতপুত্রহারা হইয়াও পাণ্ডবদের প্রতি ক্রোধ করিলেন না। গভীর দুঃখ বক্ষে থাকিলেও তিনি পাণ্ডবদের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হইয়া যুধিষ্ঠির আর হস্তিনায় ফিরিয়া রাজত্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণ অনেক বুঝাইয়া তবে তাঁহাকে হস্তিনায় আনিতে সমর্থ হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বিলাপে যুধিষ্ঠিরের মনে বিন্দুমাত্র সুখ ছিলনা। এইভাবে যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ায় প্রজাগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনে সুখ নাই। কুরুক্ষেত্রে আত্মী-স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের বিয়োগ-বেদনা তাঁহাকে পীড়া দিতে থাকিল।

হায়! দুর্য্যোধনের অন্যায় ও মূর্খতা কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে! শত শত মানুষের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির কাতর হইয়া পড়িলেন।

ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মে কর্ম্মে কালাতিপাত করিতেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী যাতে কোনপ্রকার কষ্ট না পান, সে দিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা পুত্রশোক দূর করিয়া দিতে সচেষ্ট হইলেন।

কিন্তু ভীম একদিন ধৃতরাষ্ট্রকে অত্যন্ত আঘাত দিয়া বসিলেন। তিনি পূর্ব্বের অন্যায় আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বড়ই ক্লেশ দিলেন।

ভীমের কথায় মনে বড়ই ব্যথা পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র অরণ্যে গমন করাই স্থির করিলেন।

তাঁহার নির্দ্দেশে বিদুর যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বলিলেন—ধৃতরাষ্ট্র আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। বৃদ্ধকালে অরণ্যে গমন করার বিধান শাস্ত্রে আছে, তুমি তাঁহাকে কাননে গমন করিতে অনুমতি দাও!

বিদুরের কথা যুধিষ্ঠিরের নিকট বজ্রাঘাতের তুল্য বোধ হইল।

—জ্যেষ্ঠতাত যদি আমাকে ত্যাগ করেন, তবে আমার আর গৃহবাসের প্রয়োজন কি?

এই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে আসিলেন ও তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখনকার মত বনে যাওয়া বন্ধ হইল বটে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মন আর ঘরে থাকিতে চাহিল না। তাঁহার আহারে রুচি চলিয়া গেল, রাত্রের নিদ্রা দূর হইল, গৃহবাস তাঁহার নিকট কারাবাসের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদা মনে করিতে লাগিলেন—হায়, পাপ-চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত হইল। এই সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

অবশেষে গান্ধারী তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন—এক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের

নিষেধ শুনিবার আবশ্যক নাই। ধর্ম্মের জন্য সংসারের মায়া কাটানই এখন কর্ত্তব্য।

অরণ্যে গমন করা স্থির হইলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডাকিয়া বিদায় চাহিলেন।

বিদুর বলিলেন—আমি আজন্ম তোমার পালিত, আজও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজপুরীতে থাকিতে পারিব না।

অতঃপর বল্কল পরিধান করিয়া তপস্বীর বেশে গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর বাহির হইলেন। সঞ্জয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গী হইতে বিলম্ব করিলেন না।

কুন্তী যখন শ্রবণ করিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বনে গমন করিতেছেন, তখন তিনিও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিয়া তিনিও অরণ্যগমনের বাসনা প্রকাশ করিলেন।

যাত্রার সময়ে সমস্ত জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

—কোন্ অপরাধে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। আপনার জন্য আমি পিতার অভাব ভুলিয়া ছিলাম। আপনি না থাকিলে কোন্ সুখে রাজ্যে থাকিব? হায়! আমার কোন্ অপরাধে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন? এই সমস্ত বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র নানাভাবে যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন।

অবশেষে পাঁচভাই কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্তীকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু কুন্তী কিছুতেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না।

অন্ধরাজ বনে গমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া প্রজারাও তাঁহাকে দেখিতে আসিল।

বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও কুলবধূগণ ধৃতরাষ্ট্রের বেশ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—হে অন্ধরাজ, আপনি রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছেন? কেনই বা তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়াছেন? দয়া করিয়া নিবৃত্ত হউন। আপনি বনে যাইবেন না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে পিতার ন্যায় সেবা করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র নানাভাবে প্রজাদের সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার চির পরিচিত পরমপ্রিয় রাজ্য হস্তিনা ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

অরণ্যবাসের প্রথমেই বিদুর দেহত্যাগ করেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতি সকলে যজ্ঞ, ধ্যান ও জপতপে কালযাপন করিতে থাকিলেন।

বহুদিন পরে একদিন নারদ হস্তিনায় যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন করিলে যুধিষ্ঠির অরণ্যে তাঁহার জননী, জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিলেন—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র একদিন বনে যজ্ঞ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন নাই। ফলে তপোবনে আগুন লাগিয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, সঞ্জয় ও তোমার জননী—চারিজনে যোগাসনে বসিয়া ছিলেন। অগ্নি দেখিয়াও তাঁহারা নড়িলেন না। সেই অগ্নিতে তাঁহারা প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পাঁচ ভাই মাটিতে লুটাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতঃপর আর গৃহবাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া অন্য চারিভ্রাতাও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বলা বাহুল্য, দ্রৌপদীও তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার যথানিয়মে অর্পণ করিয়া চারিভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন। এই হস্তিনা হইতে একটি কুকুরও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

চতুর্দ্দিকে প্রজাগণ করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।

—হে মহারাজ, আপনি ভ্রাতৃগণ ও পত্নীকে লইয়া কোথায় যাইতেছেন? একদিন জনকজননী-রূপে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আজ কোন্ দোষে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন?

যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিলেন ও পূর্ব্ব-মুখে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

তাঁহারা পথ চলিতেছেন, এমন সময়ে হুতাশন আসিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন—এক্ষণে স্বর্গবাস করিতে যাইতেছ। তোমার অস্ত্রের আর কোন প্রয়োজন নাই। গাণ্ডীব, ধনুক ও তূণপূর্ণ শর-সমূহ আমাকে অর্পণ কর। ধনঞ্জয় অগ্নিকে সমস্ত প্রদান করিলেন। অতঃপর পাঁচভ্রাতা করজোড়ে হুতাশনকে প্রণাম করিয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

পথে তাঁহাদিগকে নানাবিধ বিপদ ও প্রলোভনে পড়িতে হইল। কিন্তু পাণ্ডবেরা সে সমস্ত বিপদ ও প্রলোভন জয় করিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিলেন।

হরি পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সময় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, দারুণ হিমে সেখানে বহু প্রাণী মরিয়া পড়িয়া আছে। এইখানে উপস্থিত হইলে অসহ্য হিমে দ্রৌপদী মূর্চ্ছিতা হইয়া পর্ব্বতের উপর পড়িয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির অগ্রগামী হইয়া চলিয়াছেন, তিনি দ্রৌপদীর পতনের বিষয় কিছুই জানিলেন না। তখন পশ্চাৎ হইতে ভীম অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া দ্রৌপদীর পতনের কথা জানাইলে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীম প্রশ্ন করিলেন—মহারাজ, দ্রৌপদীর কোন্ পাপে পতন ঘটিল? যুধিষ্ঠির বলিলেন—দ্রৌপদী আমাদের অপেক্ষা অর্জ্জুনকে অধিক ভালবাসিত বলিয়া তাহার পতন ঘটিয়াছে।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে ভীষণ হিমে সহদেব অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, সহদেব পরম

ধার্ম্মিক। সে ত জীবনে কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করে নাই ; তবে তাহার পতন ঘটিল কেন ?

যুধিষ্ঠির বলিলেন—সহদেব খুব পণ্ডিত ছিল। কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া তাহার মনে বড়ই অহঙ্কার ছিল। এই অহঙ্কারই তাহার পতনের কারণ বলিয়া জানিবে।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে ভীষণ হিমে নকুল অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অঙ্গ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল এবং তিনি আছাড় খাইয়া পর্ব্বতের উপর পড়িয়া গেলেন।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে নকুলের পতনের কথা বলিলেন। তাঁহারা নকুলের জন্য বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ, কোন্ পাপে ধার্ম্মিক নকুলের পতন ঘটিল ?

যুধিষ্ঠির বলিলেন—নকুলের মনে অহঙ্কার ছিল যে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পুরুষ। এই পাপে তাহার মৃত্যু ঘটিল।

অতঃপর যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও ভীম—এই তিনজনে দৃঢ়পদে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

আরও কিছুদূর গমন করিলে ভীষণ হিমে অর্জ্জুনের সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল। চলিতে অশক্ত হইয়া অর্জ্জুন গোবিন্দ স্মরণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া বলিলেন—মহারাজ, যাহার পরাক্রমে যক্ষ, রক্ষ সকলেই কম্পিত হইত, আজ আমাদের সেই মহাবীর ভ্রাতাও পতিত হইল! এই বলিয়া বীর বৃকোদর হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির ও ভীম দুই ভ্রাতা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া অর্জ্জুনের জন্য বহুক্ষণ শোক প্রকাশ করিলেন।

বৃকোদর অর্জ্জুনের পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন—ধনঞ্জয় আমাকে মনে মনে তুচ্ছ করিত। এইজন্য তাহার পতন ঘটিয়াছে।

অতঃপর ভীম ও যুধিষ্ঠির তুই ভাই চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পর মহাহিমে ভীমসেন বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। অশক্ত চরণ আর কিছুতেই চলিতে পারিল না এবং ভীমসেনও মূর্চ্ছিত হইয়া পর্ব্বতের উপর পতিত হইলেন।

ভীমকে পতিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহাশোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন—হায়! যাহার পরাক্রমে তিন লক্ষ হস্তীও প্রাণ ত্যাগ করে—আমার এমন ভাই পর্ব্বতে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল! আমার আর স্বর্গে যাইবার প্রয়োজন কি! হায় ভীমসেন, আমরা নিদ্রিত হইলে তুমি রাত্রি জাগরণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতে। আজ কিনা তুমিও চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে!

অতঃপর শোক সংবরণ করিয়া যুধিষ্ঠির ভাবিতে লাগিলেন—কোন্ পাপে ভীমের মৃত্যু ঘটিল! তিনি বুঝিতে পারিলেন—ভীম মিথ্যা কথা বলিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গুরু দ্রোণের মৃত্যু ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই জন্যই ভীমের পতন ঘটিয়াছে জানিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির একাকী পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর ইন্দ্র আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—মহারাজ, আমার রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে চলুন।

যুধিষ্ঠির কাতরস্বরে ইন্দ্রকে বলিলেন—হে দেবরাজ, আমার আর স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা নাই। পথে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণকে হারাইয়া আসিয়া আমি একাকী কিরূপে স্বর্গসুখ ভোগ করিব!

ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন—মহারাজ সেজন্য চিন্তা করিও না, স্বর্গে তাহাদের সহিত তোমার অবশ্য মিলন ঘটিবে।

এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার সঙ্গী সেই কুকুরটিকে লইয়া রথে আরোহণ করিতে গেলেন। কিন্তু ইন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন—মহারাজ, আপনি বিচক্ষণ হইয়া এ কি অদ্ভুত কার্য্য করিতে যাইতেছেন! এই কুকুরটিকে কেন স্বর্গে লইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? উহার এমন কি পুণ্য আছে যে, সশরীরে স্বর্গে যাইবে? কিন্তু যুধিষ্ঠির কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হইয়া বলিলেন—দেবরাজ, আমি শরণাগতকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই কুকুরটি হস্তিনা হইতে আমার অনুগমন করিতেছে। কিছুতেই কোন অবস্থাতেই আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। আজ স্বর্গের লোভে যদি আমি তাহাকে পরিত্যাগ করি, তবে আমার অধর্ম্ম হইবে। আমি এইরূপ স্বার্থপরতা ও নীচতা লইয়া স্বর্গে গমন করিতে ইচ্ছুক নহি।

তখন অকস্মাৎ কুকুরটি অদৃশ্য হইল এবং সেই স্থানে ধর্ম্ম দেখা দিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—বৎস, আমি তোমার ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমি কেবল তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই কুকুরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলাম। বড়ই আনন্দের বিষয়, তুমি মহত্ত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। এক্ষণে তোমার যোগ্য স্থান স্বর্গে গমন কর। অতঃপর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

সমাপ্ত